POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমালঞ্জন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঞ্জনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

( মায়েদা: ৮৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 38

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

23 শে সেপ্টেম্বর, 2021 ● 15 সফর 1443 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

### প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদকা করা আবশ্যক।

১৪৩৬) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদকা করা আবশ্যক। লোকেরা বলল,'হে আল্লাহ্‌র নবী! যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না?' তিনি (সা.) বললেন,'সে নিজ হাতে পরিশ্রক করুক, নিজেও কাজে লাগাক এবং সদকাও দান করুক।' তারা বলল,'যদি এমনটিও সম্ভব না হয়? তিনি (সা.) বললেন,' অভাবীরা বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করুক।' তারা বলল, 'যদি এও সম্ভব না হয়?' তিনি উত্তর দিলেন, ' তাদের উচিত সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকা , এটিই তার জন্য সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।'

১৪৪৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'এমন কোন দিন উদিত হয় না, যেদিন দুই ফিরিশতা নাযেল হয় যখন কোন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলে,'ব্যয়কারীকে প্রতিদান দাও।' দ্বিতীয়জন বলে, 'কৃপণের ধন বিফলে যাক।'।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান, ২০০৮)

************

## এই সংখ্যায়

**খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২০ শে আগস্ট ,২০২১**
**হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),**
**প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)**
**হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ**

**আমি তোমাদের বলছি, যে পন্থা আঁ হযরত (সা.) অবলম্বন করেন নি, তা শুধুই নিরর্থক। এই জামাত প্রতিষ্ঠার পিছনে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এমন একটি জামাত তৈরী করা, যেমনটি আঁ হযরত (সা.) তৈরী করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) কে অনুসরণ করা ত্যাগ করে কেউ যদি আজীবন চেষ্টা করে যায়, তবু সে পরম উদ্দেশ্য লাভ করতে পারবে না।**

**হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী**

## খোদার ভালবাসা ও কৃপা

একথাটি কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কুরআন শরীফের কিছু অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এক স্থানে কোন একটি বিষয়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়, অপরদিকে অন্যত্র সেই একই বিষয়কে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। ভিন্ন বাক্যে দ্বিতীয় বর্ণনাটি প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যা। কাজেই এখানে উল্লেখিত صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ফাতিহা: ৭) আয়াতে একটি বিষয়ের প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে।কিন্তু অন্যত্র 'মুনইম আলাইহিম'-নিজেই উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। مِنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ (আন নিসা: ৭০) আয়াতে বলা হয়েছে পুরস্কার প্রাপ্তরা চার শ্রেণীর মানুষ-নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ। নবীগণের মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটে। কেননা, এই চারটির মধ্যে নবীই হল শ্রেষ্ঠতম পদমর্যাদা। এই উৎকর্ষগুলিকে অর্জন করার জন্য একদিকে যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, আঁ হযরত (সা.) নিজের কর্মপন্থার মাধ্যমে দেখানে পথে তা অর্জনের চেষ্টা করা।

**আঁ হযরত (সা.) নির্দেশিত পথ কখনও ত্যাগ করো না।**

আমি তোমাদের একথাও বলতে চাই যে, অনেকে স্ব-উদ্ভাবিত মন্ত্র ও প্রার্থনা-সঙ্গীতের মাধ্যমে এই উৎকর্ষগুলিকে অর্জন করার বাসনা করে, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে পন্থা আঁ হযরত (সা.) অবলম্বন করেন নি তা শুধুই নিরর্থক। প্রকৃত পুরস্কার প্রাপ্তির পথে আঁ হযরত (সা.)এর চাইতেও বেশি অভিজ্ঞ কি কেউ হতে পারে যাঁর মধ্য দিয়ে নবুয়তের সকল উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে? তাঁর অনুশীলিত পথই সঠিকতম তথা নিকটতম; আমার মতে, সেই পথ ত্যাগ করে অন্য কিছু উদ্ভাবন করা, বাহ্যত যতই সুখকর বলে প্রতিভাত হোক না কেন, তা ধ্বংসকে ডেকে আনার নামান্তর আর খোদা তা'লা আমার নিকট এমনটিই প্রকাশ করেছেন।

আঁ হযরত (সা.)=এর প্রকৃত অনুসরণের মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যায়; তাঁকে অনুসরণ করা ত্যাগ করে কেউ যদি আজীবন চেষ্টা করে যায়, তবু সে পরম উদ্দেশ্য লাভ করতে পারবে না।.......

অতএব, আঁ হযরত (সা.)-এর পথ ত্যাগ করো না। আমি দেখছি যে, লোকেরা নানান প্রকারের মন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছে, উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে, বৈরাগীদের ন্যায় তপস্যা করে। কিন্তু এসব কিছুই বৃথা। এমন উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা, কিম্বা 'নফি ও আসবাত' (ইতিবাচক ও নঙর্থক) নিয়ে ধ্যান করা নবীদের রীতি নয়। আঁ হযরত (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা এই কারণেই সর্বোত্তম আদর্শ নামে অভিহিত করেছেন। لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (আল আহযাব:২২) । আঁ হযরত (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর, তাঁর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করো না।

### জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

বস্তুত, পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে যে শ্রেষ্ঠগুণাবলী রয়েছে এবং صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (সুরা ফাতিহা: ৭) আয়াতে যে বিষয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করেছেন, তা অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্য আর আমাদের জামাতকে বিশেষভাবে এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেননা, এই জামাত প্রতিষ্ঠার পিছনে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এমন একটি জামাত তৈরী করা, যেমনটি আঁ হযরত (সা.) তৈরী করেছিলেন। যাতে এই শেষ যুগে এই জামাত কুরআন শরীফ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর সাক্ষী হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

## ১২৬ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২১ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৪, ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর ২০২১ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# অস্ট্রেলিয়ার খুদ্দামদের সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

জামাত আহমদীয়া সুইডেনের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যবর্গ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে ২৯ শে আগস্ট, ২০২০ তারিখে (অন লাইন) সাক্ষাত (শেষাংশ)

নামাযের দিকে মনোযোগ আছে কি না তা লক্ষ্য রাখা। এছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যার জন্য সব থেকে জরুরী হল কুরআন করীম। আমরা কি প্রত্যহ কুরআন করীম পাঠ করছি কি না সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা, বিশেষ করে পদাধিকারীদের প্রতি। আপনি যদি জাতীয় স্তর থেকে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র পদাধিকারীদেরকেই বেছে নেন, তবে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি রিপোর্ট আপনি তাদের কাছ থেকেই পেয়ে যাবেন। তারা কি কুরআন করীম পাঠ করেন? কি করণীয় আর কি নিষিদ্ধ, সে সম্পর্কে কুরআন করীমে বহু আদেশাবলী আছে, সেগুলি কি পালন হয়। যদি কোন আদেশ পালন না হয়ে থাকে তবে জামাতের কি কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত? সর্বপ্রথম নিকটজনদের দিয়ে শুরু করুন। আপনার সব থেকে যারা কাছের, তারা আপনার ন্যাশনাল আমেলার সদস্যবৃন্দ। এরপর রয়েছে আপনার স্থানীয় জামাতের আমেলা সদস্যরা। এর পাশাপাশি প্রত্যেক আমেলা সদস্যের পরিবারের লোকজন রয়েছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি এইভাবে ভাবে আর তরবীয়ত শুরু করে দেয় তবে নব্বই শতাংশ জামাত কভার হয়ে গেল, সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজ পুরো হয়ে গেল। কিন্তু যদি শুধু বলি, আমরা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলাম, জামাতগুলিতে কর্মসূচি তৈরী করে দিয়েছিলাম, সদর জামাত রিপোর্ট পুরো করে পাঠিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই চোখে না পড়ে তবে এর লাভ কি?

আসল কথা হল, একজন আহমদীর জানা থাকা উচিত যে তার দায়িত্ব কি কি? আর তার সব থেকে বড় দায়িত্ব হল খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা। কুরআন করীমের উপর আমল করা, সেই সব আদেশাবলীকে বিশেষভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেগুলির উল্লেখ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের করণীয় কি, আমাদের দায়িত্বাবলী কি কি আর আমাদের নমুনা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, খিলাফতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন রাখা উচিত- এ বিষয়ে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে ক্রমাগত দিক-নির্দেশনা আসতে থাকে, সেগুলি নিজেরাও মেনে চলুন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও মেনে চলার নির্দেশ দিন। খুতবা শোনে কি না, শুনলে কতজন শোনে, তার উপর আমল হচ্ছে কি না? পারিবারিক অবস্থা কেমন? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন? সন্তানের লালন পালন এবং জামাতের সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? স্ত্রী সন্তানদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন? এই সব বিষয়গুলিই দেখার। চারটি লাইন তৈরী করে বলে দিলাম যে ফর্ম তৈরী করেছিলাম, পুরণ করে দিয়েছি- এই বলে দায় সারা কাজ করলে হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নামায পড়া তো ফরয, যে নামায পড়ে না সে তো পাপী। তাই নামায পড়ার সত্তর বা পঞ্চাশ শতাংশ লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলা আহামরি কিছুই না। যারা নামায পড়ে না, তাদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নামায পড়া কুরআন করীমের প্রাথমিক আদেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম থেকেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, 'আল্লাযীননা ইউমেনুনা বিল গাইবে ওয়া ইউকিমুনাস সলাত'। অর্থাৎ-অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার পাশাপাশি নামাযেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা অমুক কাজ করেছি বলে দিলেই তরবীয়ত হবে না। আপনার কাছে উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকা চাই। সেই পরিকল্পনাকে সর্বপ্রথম যারা বাস্তবায়িত করবে তারা হল আপনাদের আমেলা সদস্যবৃন্দ। ন্যাশনাল আমেলা এবং স্থানীয় আমেলা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আমেলা সদস্যদের কাজ হল নিজেদের বাড়িতে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। তাই আমি যে সব কথা বলেছি, তা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি যে আপনারা কি অর্জন করলেন? যদি আপনাদের নিজেদের তরবীয়ত হয়ে যায়, তবে আপনাদের পারিবারিক সমস্যাও থাকবে না আর সন্তানদের তরবীয়তের সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। যুবকরা যে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করার দিকে ঝুঁকছে, সেই প্রবণতাও থাকবে না, মেয়েদের ভাল পরিবার থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে শুরু করবে, মেয়েদের মধ্যেও এই চেতনাবোধ গড়ে উঠবে যে আহমদীদেরকেই বিয়ে করতে হবে, একই কথা ছেলেদের জন্যও প্রযোজ্য। দৈনন্দিন বিষয়াদি সংক্রান্ত বিবাদগুলির অবসান ঘটবে। চাঁদা আদায়ের সমস্যারও সমাধানহবে। তাই তরবীয়ত বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছোট জামাতগুলিকে তো আদর্শ জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেননা, প্রত্যেক সদস্যের কাছে পৌঁছনো সহজ হয়ে যায়। সদর জামাত, আমীর জামাত, মিশনারী এবং পদাধিকারী প্রত্যেকের সম্পর্কে জানা থাকা উচিত, তাদের সম্পর্কে পুরো তথ্য থাকা উচিত। আমি সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি; আপনারা তো নিজেদের জামাতে থাকেন, আপনারা কেন চিনবেন না?

* সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার বলেন, তবলীগের একটি লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করতে হবে। সুইডেনে বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস। আরবের মানুষও অনেকে এসেছে। এশিয়ান ও আফ্রিকানরাও এসেছে। এছাড়া স্থানীয় সুইডিশরা তো আছেনই। প্রত্যেকের জাতিগত পরিচয় অনুসারে তাদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করুন। এরপর তাদের আগ্রহ ও রুচি অনুসারে,তাদের প্রশ্ন অনুসারে আপনাদের কাছে বই-পুস্তকও থাকা চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের পৃথক পরিচিত গড়ে না উঠবে,লোকে জানবে না যে আহমদীয়াত কি বা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি? বই-পুস্তক ও পামফ্লেট যা আপনারা বিতরণ করেন, আপনাদের মুরুব্বী সাহেবও রিপোর্ট দেন যে এত লক্ষ্য বিতরণ করা হয়েছে, কিন্তু এত লক্ষ বিতরণ করার পরও লোকেরা জামাত সম্পর্কে পরিচিত নন। এ সম্পর্কেও জানা থাকা উচিত যাতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিগুলি দূর করা যায়। সম্প্রতি একজন ঘোষণা করছে যে সে নাকি কুরআন পুড়িয়ে ফেলবে। পুলিশ তাকে এই কাজ করার অনুমতি দেয় নি সেকথা ভিন্ন, কিন্তু সেই সঙ্গে আবেদন করারও অধিকার দিয়েছে। তার কিছু অনুগামী কিম্বা সংগঠনের কিছু সদস্য কাল রাত্রিতে পার্কে গিয়ে পুড়িয়েও ফেলেছে- এমনটি কেন হচ্ছে? এজন্য যে তারা জানেই না যে ইসলামের শিক্ষা কি, কুরআন করীমের শিক্ষা কি? মুসলমানদের যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রয়েছে তা থেকে এটিই প্রকাশ পায় যে, কুরআন করীমেই হয়তো এমনটি লেখা আছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি আয়াতকে তারা ধরে বসে আছে, কিন্তু যুদ্ধের যে সমস্ত শর্তাবলী বা সে সমস্ত নৈতিক শিক্ষাবলী রয়েছে, সেগুলির প্রতি এদের দৃষ্টি নেই। এই বিষয়গুলি এদেরকে জানাতে হবে। এদিক থেকেও আপনারা তবলীগের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

ওয়াকফে নও-এর ন্যাশনাল সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মূল কাজ হল তাদেরকে একথা বলে উৎসাহিত করা যে আমাদের ডাক্তার, শিক্ষকের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রগুলিতে বেশি উৎসাহ প্রদান করা দরকার। সুইডেন থেকে জামেয়াতে শিক্ষার্জনকারী কেবল দুইজন আছে, তাও আবার একই পরিবারের। অন্য পরিবারগুলিরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

যাকে আমি অনুমতি দিই, তাকে সেই সঙ্গে একথাও বলে দিই যে নিজের কাজ করার পাশাপাশি বেশি সময় জামাতের সেবায় ব্যয় কর। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে থাক। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলিতে যে সময়টুকু পাও তা জামাতকে দাও। এছাড়াও যদি অতিরিক্ত সময় পাও সেটুকুও জামাতকে দাও। আর যারা একেবারেই কাজ করে না, দুনিয়াদারিতে ডুবে আছে, তার সম্পর্কে মরকযকে অবগত করুন যাতে তার ওয়াকফে নও উপাধি লোপ করা হয়। আমরা উপাধি লাগিয়ে রাখব না, সংখ্যা বাড়িয়ে কি লাভ? তাকেই ওয়াকফে নও বলব, যে আমার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও জাগতিক কাজকর্মের পাশাপাশি ওয়াকফের চেতনা নিয়ে নিজেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে উপস্থাপন করে। অনেকে আছে যারা ধর্মের সেবা করে, কিন্তু ওয়াক নয়। তাদের মধ্যে ধর্মসেবার এমন এক অনুপ্রেরণা আছে, দেখে মনে হয় যেন চব্বিশ ঘন্টা জামাতেরই সেবা করছে।

মিটিংয়ের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদের সঙ্গেও মিটিং করুন যারা চাকুরীজীবি। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন যে তারা ওয়াকফে নও,তারা যেন জামাতকে সময় দেয়। আর কিছু না হলেও অন্তত সপ্তাহান্তে তবলীগের জন্য যেন সময় দেয়। লিটেরেচার বিতরণ করে, বুক স্টল লাগায় Ask a Muslim এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ওয়াকফাতে নও ছাড়াও ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা অনেক, এদের সকলকে অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করুন।

* ন্যাশনাল ওসীয়্যত সেক্রেটারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার পর হুযুর আনোয়ার বলেন,'চাঁদা আদায় করাই লক্ষ্য নয়, ওসীয়তের অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোই কাজই নয়। তাদের তাকওয়ার মান উন্নত করার বিষয়েও কি চেষ্টা করা হয়েছে?

একজন মূসীকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযী হতে হবে, প্রত্যহ কুরআন পাঠকারী হতে হবে, এর পাশাপাশি কুরআনের অনুবাদ জানতে হবে এবং এর বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তক পড়তে হবে, খলীফাগণের নির্দেশ পালনকারী হতে হবে, যুগ খলীফার খুতবা নিয়মিত শুনতে হবে, নিজ পরিবারে স্ত্রী ও সন্তানের তরবীয়তের বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। মূসীদের মধ্যে এই সব বিশেষত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। আর ওসীয়তকারী যদি মহিলা হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিজেদের পর্দার মানকে সমুন্নত রাখতে হবে। আর নারী ও পুরুষ উভয়কেই নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। একজন আদর্শ মূসীকে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত মান বজায় রাখতে হবে-আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও, ধর্মীয় অবস্থার ক্ষেত্রেও, আধ্যাত্মিক অবস্থার অবস্থার

*(এরপর ৯ এর পাতায়...)*

# জুমআর খুতবা

**হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি যেমনটি চান,তেমনটিই করুন। আপনি নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর সিদ্ধান্ত নিন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আপনি আমাদের আদেশ করুন, আমরা আপনার আনুগত্য করব। আমাদের আহ্বান করুন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব। আপনি আমাদেরকে (যেখানে খুশি) প্রেরণ করুন, আমরা রওনা হয়ে যাব। আপনি যদি আমাদেরকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান, আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।**

**ফলাফলের নিরিখে নিহাওয়ান্দের বিজয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে তা 'ফাতহুল ফুতুহ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, অর্থাৎ সকল বিজয়ের চেয়ে উত্তম বিজয়।**

**আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। "**

**জুন্দায়ী সাবুর-এর যুদ্ধ, ফাতহুল ফাতাহ তথা নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধ,ইসফাহানের যুদ্ধের বিবরণ।**

**তিনজন মরহুমীনের উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব, যাঁরা হলেন- ইন্ডোনেশিয়ার মুবাল্লিগ মহম্মদ দিয়ানতানু সাহেব, মাননীয় সাহেবযাদা ফারহান লতিফ সাহেব (শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র) এবং মাননীয় মালিক মুবাশ্বির আহমদ সাহেব (সাবেক আমীর জামাত দাউদ খিল মিঞা ওয়ালী, লাহোর)**

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২০ আগস্ট, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা ( ২০ জহুর, ১৪০০ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত উমর (রা.)'র যুগের আলোচনা হচ্ছে, সে সময় যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হচ্ছিল সে সবের একটি হলো 'জুন্দায়ে সাবুর' এর যুদ্ধ। হযরত আবু সাবরাহ্ বিন রুহম সাসানীয় (বা ইরানী) জনপদগুলো জয় করার পর সৈন্যদের নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন আর জুন্দায়ে সাবুর এ শিবির স্থাপন করেন। জুন্দায়ে সাবুর হলো প্রাচীন খুযিস্তানের একটি শহর। যাহোক, (সেখানে) তাদের অর্থাৎ শত্রুদের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তিনি নিজের জায়গায় অবিচল থাকেন। (এরইমধ্যে) এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে বসে। শত্রুরা দুর্গের ভেতরে থাকতো আর সুযোগ বুঝে বাইরে এসে আক্রমণ করতো। (কিন্তু) একজন মুসলমান যখন (নিরাপত্তার) প্রস্তাব দেয়, কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নয়, বরং একজন সাধারণ মুসলমান (প্রস্তাব) দেয়, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের দ্বার খুলে দেয়। গবাদিপশু বাইরে বেরিয়ে আসে, বাজার-হাট খুলে যায়, আর লোকজন যত্রতত্র চোখে পড়ে। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা (উত্তরে) বলে, আপনারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আর আমরা তা গ্রহণ করেছি। আমরা কর প্রদান করবো আর আপনারা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন। মুসলমানরা বলে, আমরা তো এমনটি করিনি। তারা বলে, আমরা মিথ্যে বলছি না। এরপর মুসলমানরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় যে, মিকনাফ নামের একজন ক্রীতদাস একাজ করেছে। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বস্ততাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অঙ্গীকার পূর্ণ না করা পর্যন্ত তোমরা বিশ্বস্ত প্রমাণিত হতে পারবে না। যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, ক্রীতদাস করলেও তা পূর্ণ করো। যতক্ষণ তোমাদের সন্দেহ থাকবে (ততক্ষণ) তাদেরকে অবকাশ দাও এবং তাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করো। অতএব, মুসলমানরা অঙ্গীকারের সত্যায়ন করে এবং (সেখান থেকে) ফিরে আসে।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আসসালাবী, পৃ: ৪২৫) ( সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত কে কারনামে, পৃ: ৬৮৯) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৮)

এই যুদ্ধটি খুযিস্তান বিজয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৩৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস একটি জাতীর সাথে এই চুক্তি বা সন্ধি করেছিল যে, তোমাদেরকে অমুক অমুক ছাড় দেওয়া হবে। ইসলামী সৈন্যদল সেখানে গেলে সেই জাতি বলে, আমাদের সাথে তো এই চুক্তি রয়েছে। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই চুক্তি মানার ক্ষেত্রে টালবাহানা করে। বিষয়টি হযরত উমর (রা.)'র সমীপে গেলে তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানের কথা বা অঙ্গীকার মিথ্যা হওয়া উচিত নয়, তা সে ক্রীতদাসই করুক না কেন। "

(বাআয জরুরী আমুর, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ: ৪০৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগে একটি শত্রুসেনাদল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আর তারা বুঝতে পারে যে, তাদের রক্ষা নেই। পূর্বে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এটি তার বিস্তারিত বিবরণ, তিনি (রা.) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ইসলামী সেনাপতি জোরপূর্বক আমাদের দুর্গ দখল করছে, যদি সে দখল করে নেয় তাহলে আমাদের সাথে বিজিত দেশের মত ব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক মুসলমান পরাজিত হওয়া এবং সন্ধি করার মধ্যকার পার্থক্য (কি তা) জানতো। বিজিতদের জন্য তো সাধারণ ইসলামী আইন কার্যকর হতো আর সন্ধির ক্ষেত্রে তারা অর্থাৎ অপর পক্ষ যত শর্তই নিরূপণ করত বা যত বেশি সম্ভব অধিকার মানাতে পারতো মানাতো। তারা ভাবলো, এমন কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত যাতে নরম বা সহজ শর্তে সন্ধি হয়ে যায়। অতএব একদিন কৃষ্ণাঙ্গ এক ক্রীতদাস পানি ভরছিল, তার কাছে গিয়ে তারা বললো, হে ভাই! (বলতো) যদি সন্ধি হয়ে যায় তা যুদ্ধের চেয়ে ভালো নয় কি? সে বলে, অবশ্যই ভালো। সেই কৃষ্ণাঙ্গ অশিক্ষিত ছিল। তারা বলে, তাহলে এই শর্তে সন্ধি হলে উত্তম হয় যে, আমরা আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করব আর আমাদের কিছুই বলা হবে না। আমাদের ধনসম্পদ আমাদের কাছে থাকবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছে থাকবে। সে বলে, একদম ঠিক। (পরক্ষণে) তারা দুর্গের দ্বারগুলো খুলে দেয়। এরপর ইসলামী বাহিনী আসলে তারা অর্থাৎ শত্রুরা বলে, আমাদের সাথে তো তোমাদের সন্ধি হয়ে গেছে। তারা অর্থাৎ মুসলমানরা বলে, সন্ধি কোথায় হলো? আর কোন কর্মকর্তা তা করেছে? তারা বলে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা কীভাবে জানবো যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মকর্তা আর কে নয়? এক ব্যক্তি এখানে পানি ভরছিল, তাকে আমরা এই কথা বলেছি আর সে আমাদের উক্ত কথা বলেছে। মুসলমানরা বলে যে, দেখ! এক ক্রীতদাস বের হয়েছিল, তাকে জিজ্ঞেস কর যে, কী হয়েছে। সে বলে যে, হ্যাঁ। অর্থাৎ সেই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে যে, হ্যাঁ, আমার সাথে কথা হয়েছিল। তখন মুসলমানরা বলে, সে তো এক ক্রীতদাস ছিল, তাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার কে দিয়েছে? তখন শত্রুরা বলে, আমরা কীকরে বলব যে, সে তোমাদের কর্মকর্তা কি-না। আমরা অপরিচিত আর আমরা ভাবলাম যে, সে-ই তোমাদের জেনারেল অর্থাৎ (তারা) ধূর্ততার আশ্রয় নেয়। তখন সেনাপ্রধান বলেন, আমি তা মানতে পারি না, কিন্তু আমি এই ঘটনা হযরত উমর (রা.)'র কাছে লিখে পাঠাচ্ছি। এই পত্র পেয়ে হযরত উমর (রা.) বলেন, ভবিষ্যতের জন্য এই ঘোষণা করে দাও যে, সেনাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ শান্তিচুক্তি করতে পারবে না। কিন্তু এটি হতে পারে না যে, এক মুসলমান কথা দিবে আর আমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব। এখন সেই কৃষ্ণাঙ্গ যে সন্ধি করে ফেলেছে তা তোমাদের মেনে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতের জন্য এই ঘোষণা করে দাও যে, সেনাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ কোন জাতির সাথে সন্ধি করতে পারবে না।

(সেইরে রূহানী (৭) ,আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৯৩-২৯৪)

হযরত উমর (রা.)'র ইরান বিজয়ের পেছনে কী কী কারণ ছিল, কেন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন- এসব বিষয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিক বাসনা ছিল, যদি ইরাক ও আহওয়ায-এর যুদ্ধেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে তাহলে ভালো হয়। যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। শত্রুরা আক্রমণ করছে, শত্রুকে একবার পরাজিত করা হয়েছে, তাদের শক্তিকে পদদলিত করা হয়েছে, এখানেই (সবকিছু) শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। তিনি (রা.) বার বার এই বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন যে, হায়! আমাদের ও ইরানীদের মাঝে যদি এমন কোন প্রতিবন্ধক থাকতো যার ফলে না তারা আমাদের দিকে আসতে পারতো আর না আমরা তাদের দিকে যেতে পারতাম। কিন্তু ইরানী সাম্রাজ্যের ক্রমাগত সামরিক তৎপরতা তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হতে দেয় নি। ১৭ হিজরী সনে মুসলিম সেনা কর্মকর্তাদের একটি দল হযরত উমর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হয়। হযরত উমর (রা.) সেই দলের সামনে এই প্রশ্ন রাখেন যে, বিজিত অঞ্চলগুলোতে বার বার কেন চুক্তিভঙ্গ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়? হযরত উমর (রা.) এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা (হয়ত) বিজিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে। এ কারণেই চুক্তিভঙ্গ হচ্ছে। দলের সদস্যরা এই বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, না, বিষয়টি এমন নয় এবং বলেন, আমাদের জানা মতে মুসলমানরা পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সুশাসন করে থাকে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এই গণ্ডগোলের কারণ কী? দলের অন্যান্য সদস্যরা এর কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেন নি, কিন্তু আহনাফ বিন কায়েস বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করছি। আসল কথা হলো, আপনি আমাদেরকে আর কোন সামরিক অগ্রাভিযান করতে বারণ করেছেন যে, আর যুদ্ধ করবে না এবং যতটা অঞ্চল জয় হয়েছে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইরানের বাদশাহ্ এখনও জীবিত আছে আর তার বর্তমানে ইরানীরা আমাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখবে। এটি কখনও সম্ভব নয় যে, এক দেশে দুই সরকার থাকবে। যে কোন অবস্থায় একটি অপরটিকে বের করেই ছাড়বে। হয় ইরানীরা থাকবে না হয় আমরা থাকব। তিনি বলেন, আপনি জানেন যে, আমরা কোন একটি এলাকাও জবর দখল করি নি, বরং শত্রুদের আক্রমণ করার ফলে জয় করেছি। আমরা নিজে থেকে তো কখনও যুদ্ধ আরম্ভ করি নি আর এটিই আপনার নির্দেশ ছিল। শত্রুরা আক্রমণ করলে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হতো আর এরপর সেসব এলাকা জয়ও হতো। যাহোক,মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা অকারণে যুদ্ধ করার বৈধতা খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্যও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের জন্যও এতে উত্তর চলে এসেছে যে, মুসলমানরা কখনও ভূমি দখল করার জন্য আর দেশ জয় করার জন্য যুদ্ধ করতো না, বরং তাদের ওপর আক্রমণ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো, যার ফলশ্রুতিতে বিজয়ও অর্জিত হতো। যাহোক, তিনি বলেন, সৈন্যবাহিনী তাদের বাদশাহ্র পক্ষ থেকে আসে। আর তাদের এরূপ আচরণ ভবিষ্যতেও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতদিন আপনি আমাদেরকে সামরিক অগ্রাভিযানের এবং সম্রাটকে পারস্য থেকে বিতাড়িত করার অনুমতি না দিবেন। এরূপ হলেই পারস্যবাসীদের পুনরায় বিজয় লাভের আশা ভঙ্গ হতে পারে।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৩৬-১৩৮)

আসল বিষয় এটিই ছিল। হযরত উমর (রা.) এই মতামতকে সঠিক আখ্যা দিয়ে এটি উপলব্ধি করেন যে, এখন ইরানে অগ্রাভিযান করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই; এটি ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, নতুবা মুসলমানদের রক্ত ঝরতে থাকবে আর যুদ্ধ হতে থাকবে। কিন্তু তবুও কার্যত এর সিদ্ধান্ত হযরত উমর (রা.) আরো দেড়-দুই বছর পর ২১ হিজরী সনে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের পর করেছেন, যখন ইরানীরা প্রবল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে বের হয়েছিল আর নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তুমুল লড়াই হয়েছিল।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধকে ফাতহুল ফুতুহ্-ও বলা হয়ে থাকে। ইরান এবং ইরাকে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানগুলোর মাঝে তিনটি যুদ্ধ চূড়ান্ত লড়াইয়ের মর্যাদা রাখে, অর্থাৎ, কাদসিয়ার যুদ্ধ, জলুলার যুদ্ধ এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ। আর নিজ ফলাফলের নিরিখে নিহাওয়ান্দের বিজয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে তা 'ফাতহুল ফুতুহ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, অর্থাৎ সকল বিজয়ের চেয়ে উত্তম বিজয়।

নিহাওয়ান্দের এই যুদ্ধ প্রথম দু 'টি বড় পরাজয়ের পর ইরানীদের পক্ষ থেকে এমন আক্রমণের সর্বশেষ চেষ্টা ছিল। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজর্দ, যে কিনা তখন মারভ-এ অবস্থান করছিল, অথবা আবু হানিফা দেনাভরির বর্ণনামতে কুম-এ অবস্থান করছিল, অত্যন্ত তৎপরতার সাথে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য একত্রিত করতে আরম্ভ করে আর নিজ পত্রাদির মাধ্যমে খুরাসান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত পুরো দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়।আর সকল দিক থেকে ইরানী সৈন্যরা দলে দলে নিহাওয়ান্দে সমবেত হতে থাকে।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত) (আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১) (তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৩৯)

নিহাওয়ান্দ হলো, ইরানের একটি শহর যা কিরমানশাহের পূর্বে অবস্থিত এবং হামদান প্রদেশের রাজধানী- হামদান থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

(এটলাস ফুতুহাতে ইসলামিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ১১৮)

নিহাওয়ান্দ সম্পূর্ণরূপে পাহাড়ে ঘেরা একটি শহর ছিল।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আসসালাবী, পৃ: ৪২৬)

হযরত সা'দ (রা.) এই সৈন্য সমাবেশের সংবাদ হযরত উমর (রা.)'র সমীপে মদীনায় প্রেরণ করেন। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২২)

কিছু দিন পর যখন হযরত উমর (রা.) স্বয়ং হযরত সা'দ (রা.)-কে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং হযরত সা'দ (রা.) মদীনায় যাওয়ার সুযোগ পান, তখন তিনি এই সমস্ত সংবাদ হযরত উমর (রা.)'র সমীপে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২২)

হযরত সা'দ (রা.)-কে অব্যাহতি দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খিলাফতের পক্ষ থেকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে প্রদান করা হয়। হযরত আম্মার (রা.) ইরানীদের এই সামরিক তৎপরতার যেসব সংবাদ পেতেন সবই মদীনায় প্রেরণ করতে থাকেন।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৭০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০) (আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১) (তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৪০)

হযরত উমর (রা.) শূরা বা পরামর্শ ডাকেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা দেন। যাতে তিনি (রা.) বলেন, "হে আরব জাতি! আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের সমর্থন করেছেন এবং বিভেদের পর তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন আর অনাহারে থাকতে তিনি তোমাদের সম্পশালী করেছেন। যে ক্ষেত্রেই তোমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে তিনি সেখানে তোমাদের বিজয় দান করেছেন। অতএব, তোমরা না কখনও ক্লান্তশ্রান্ত হয়েছ, আর না পরাজিত হয়েছ। এখন শয়তান আল্লাহ্র জ্যোতিকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু সৈন্য একত্রিত করেছে। এটি আম্মার বিন ইয়াসেরের পত্র। কুমেস, তাবারিস্তান, নিমবাওন্দ, জুরজান, আসফাহান, কুম, হামাদান, মাহেন এবং সাবাযানের অধিবাসীরা তাদের বাদশাহ্র কাছে একত্রিত হচ্ছে কূফা ও বসরায় অবস্থানরত তোমাদের ভাইদের মোকাবিলা করার জন্য এবং তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে স্বয়ং তোমাদের দেশের ওপর আক্রমণ করার জন্য। অতএব হে লোকেরা! এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও।

(আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আশা করি তোমরা পরস্পর অধিক কথাবার্তা ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদানে লিপ্ত হবে না। তোমরা আমাকে অল্প বাক্যে পরামর্শ দাও, এই মুহূর্তে আমার ইরান যাত্রা করা এবং বসরা এবং কূফার মাঝে কোন উপযুক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করে নিজ সেনাদলকে সাহায্য করা আর আল্লাহ্র কৃপায় এই যুদ্ধে যদি বিজয় লাভ হয় তাহলে নিজ সেনাদল শত্রু এলাকায় আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য যাত্রা করা কি যৌক্তিক হবে?

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হযরত উমর (রা.)'র বক্তব্যের পর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ দাঁড়ান এবং তাশাহ্হুদ পাঠের পর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়াদি আপনাকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছে এবং অভিজ্ঞতা আপনাকে চৌকস বানিয়ে দিয়েছে, আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করুন এবং আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আপনি আমাদেরকে আদেশ দিন, আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য করব, আমাদেরকে ডাকলে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব। আমাদেরকে কোথাও প্রেরণ করলে আমরা রওয়ানা হয়ে যাব, আপনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত। এখন আপনি নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করুন কেননা, আপনি সব বিষয়ে অবগত আছেন এবং অভিজ্ঞও বটে। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এ কথা বলে বসে পড়েন কিন্তু হযরত উমর (রা.) আরও পরামর্শ চাচ্ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, হে লোকেরা! আরো কিছু বলো, কেননা আজকের বিষয়টি এমন যার ফলাফল হবে সুদূর-প্রসারী। তখন হযরত উসমান (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমীরুল

মু'মিনীন! আমার মতে আপনি সিরিয়া এবং ইয়েমেনে এ মর্মে নির্দেশনা প্রেরণ করুন যে, সেখান থেকে ইসলামী সেনাদল যেন ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩-৫২৪)

একইভাবে বসরার সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা প্রেরণ করুন যেন সেখান থেকেও সেনাদল (ইরানের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করে আর আপনি স্বয়ং এখান থেকে হিজাযের সেনাদল নিয়ে কূফা অভিমুখে যাত্রা করুন।

(আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৩)

এর ফলে আপনার হৃদয়ে শত্রু সেনাদলের সংখ্যাধিক্যের শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। এটি এমনই নাজুক পরিস্থিতি যার পরিণতি হবে সুদূর-প্রসারী তাই এ বিষয়ে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত এবং বন্ধুদের সাথে আপনার অবস্থান আবশ্যক।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

অর্থাৎ সামনের সারিতে স্বয়ং আপনার যাওয়া উচিত। হযরত উসমান (রা.)'র এই পরামর্শ সভার অধিকাংশ মানুষের মনঃপূত হয় এবং চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা বলে, এই প্রস্তাব যথাযথ। হযরত উমর (রা.) আরও পরামর্শ চান কেননা পূর্বোক্ত পরামর্শ হযরত উমর (রা.) গ্রহণ করেন নি তাই তিনি (রা.) বলেন, আরও পরামর্শ দাও। তখন হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন আর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি সিরিয়ার সেনাদলকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে সেই এলাকা রোমান বাদশাহ্ দখল করে নিবে আর ইয়েমেন থেকে যদি ইসলামী সেনাদল সরিয়ে নেন তাহলে হাবশা বা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ উক্ত এলাকা দখল করে নিবে। আপনি যদি এখান থেকে যাত্রা করেন তাহলে দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আপনার যাত্রার সংবাদ শুনে সবাই আপনার সহযাত্রী হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর যে সংকট মোকাবিলার জন্য আপনি যাচ্ছেন, এর চেয়ে বড় সংকট দেশ খালি করে যাওয়ার দরুন এখানে সৃষ্টি হবে। অতএব, হযরত আলী (রা.) পরামর্শ দেন যে, বসরায় এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করুন যে, (সেখানকার)মোট সেনাদল তিন ভাগে ভাগ করা হোক। একদল সেনা ইসলামী জনবসতিতে বাড়িঘর এবং এর চতুষ্পার্শ্ব সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। এক দল ঐসব বিজিত অঞ্চলে মোতায়েন করা হোক- যাদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়েছে যেন যুদ্ধের সময় সেখানকার বাসিন্দারা চুক্তিভঙ্গ করে বিদ্রোহ না করে বসে আর একদল মুসলমানদের জন্য তথা কূফাবাসীর সহায়তায় প্রেরণ করা হোক।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩,৫২৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

অনুরূপভাবে কূফাবাসীদেরকে লিখে পাঠান যে, সেনাদলের একটি অংশ সেখানেই অবস্থান করুক আর দু'ভাগ শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য যাত্রা করুক। একইভাবে সিরিয়ার সেনাদলকে আদেশ দিন যেন সেনাদলের দু'টি অংশ সিরিয়ায় অবস্থান করে এবং একটি অংশ ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর এ ধরণের অধ্যাদেশ আম্মান এবং দেশের অন্যান্য এলাকা এবং শহরগুলোর নামেও জারি করা হোক।

(আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

রণাঙ্গনে স্বয়ং আপনার যাওয়া সমীচীন হবে না; কারণ আপনার মর্যাদা একটি মুক্তোর মালার ন্যায়। যদি হার খুলে যায় তাহলে মতি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এরপর পুনরায় তা কখনও একত্রিত হবে না। এছাড়া যদি ইরানীরা জানতে পারে যে, আরবের শাসক স্বয়ং রণক্ষেত্রে এসেছেন তাহলে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে; পুরো প্রস্তুতি নিয়ে লড়াই করার জন্য আসবে। আপনি যে শত্রুর গতিবিধির কথা উল্লেখ করেছেন, স্মরণ রাখবেন খোদা তা'লা আপনার রণপ্রস্তুতি ও গতিবিধির তুলনায় শত্রুর গতিবিধিকে সাংঘাতিক ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন আর তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা ঘৃণা করেন তা পরিবর্তন করতে (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী। আবার আপনি যে শত্রু শিবিরের সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন; আমাদের অতীত ইতিহাস বলে, আমাদের লড়াই সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয় বরং ঐশী সাহায্যের ওপর আস্থা রেখেই সংঘটিত হত এবং আমাদের জয়-পরাজয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য কিংবা সংখ্যাস্বল্পতার ভিত্তিতে হতো না। এটি তো খোদার ধর্ম; যাকে খোদা বিজয়ী করেছেন আর এটি খোদার বাহিনী যাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং ফিরিশ্তা বাহিনী দিয়ে তাদেরকে সেই সাহায্য করেছেন যার ফলে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের সাথে আছে ঐশী প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিজ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন- হ্যাঁ; তোমার বক্তব্য সঠিক; যদি আমি নিজে যাত্রা করি তাহলে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর অন্যদিকে ইরানীরা সর্বশক্তি নিয়ে তাদের সঙ্গী-সাথীদের সহযোগিতার জন্য বেরিয়ে পড়বে আর বলবে- আরবের সবচেয়ে বড় শাসক স্বয়ং রণক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে। যদি আমরা এই যুদ্ধের জন্য বের হই তাহলে প্রকারান্তরে গোটা আরবকে পরাভূত করারই নামান্তর; তাই আমার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সমীচীন হবে না; অর্থাৎ শত্রুপক্ষ বলবে, যদি আমরা জয়লাভ করি তবে গোটা আরব আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে; কাজেই আমার যুদ্ধে যাওয়া সমীচীন হবে না। সেনাপ্রধান নির্বাচনের জন্য আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন কিন্তু (লক্ষ্য রাখবেন!) ইরাকে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা রাখে এমন ব্যক্তির নাম যেন প্রস্তাব করা হয়। লোকেরা হযরত উমর (রা.)-কে বলল, ইরাকের অধিবাসী এবং সেখানকারসেনাবাহিনী সম্পর্কে হুযূর নিজেই ভালো জানেন। আপনার কাছে তারা প্রতিনিধি দল হিসেবে আসা-যাওয়া করতো। আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হযরত উমর (রা.)'র দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা মহানবী (সা.)-এর একজন অন্যতম জ্যেষ্ঠ সাহাবী হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)-কে এই গুরুদায়িত্বের জন্য বেছে নেয়।

(আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নু'মান (রা.) মসজিদে নামায পড়ছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) আসেন এবং তাঁকে (রা.) লক্ষ্য করে তাঁর পাশে গিয়ে বসেন। হযরত নু'মান (রা.)'র নামায শেষ হলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে একটি পদে নিযুক্ত করতে চাই। একথা শুনে হযরত নু'মান (রা.) বলেন, সামরিক দায়িত্ব হলে আমি রাজি আছি কিন্তু কর আদায়ের কাজ হলে তা আমার পছন্দ নয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, না; সামরিক দায়িত্ব।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

কিন্তু যে বিষয়টি বেশি সঠিক বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় তাহলো, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)-কে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কে তাবারীর বর্ণনা । তাহলো ইবনে ইসহাক বলেন, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ সম্পর্কে এটিও বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুকাররিন বিন নু'মান (রা.) কাসকারে কর আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, "হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) আমাকে কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন অথচ আমার জিহাদ (যুদ্ধ) ভালো লাগে আর (আমি) যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাসনা ও আকর্ষণ রাখি।" এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে এক পত্রে লিখেন, হযরত নু'মান (রা.) আমাকে জানিয়েছেন, আপনি তাঁকে (রা.) কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন অথচ তাঁর (রা.) এ কাজ ভালো লাগে না বরং জিহাদ (যুদ্ধ) ভালো লাগে । তাই তাঁকে নিহাওয়ান্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। মোটকথা, এই গুরুদায়িত্ব হযরত নু'মান বিন মু কাররিন (রা.)'র স্কন্ধে অর্পিত হয় এবং তিনি শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সম্ভবতঃ হযরত উমর (রা.) যখন কূফায় ছিলেন তখন তিনি (রা.) এই পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রটিও এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তিনি (রা.) মদীনাতে ছিলেন না বরং কূফায় ছিলেন; তখন তিনি (রা.) এই পত্র লিখেন। আর পত্রটি এভাবে আরম্ভ হয় যে, "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)'র প্রতি সালাম রইল। অতঃপর লিখেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সংবাদ পেয়েছি, ইরানের একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিহাওন্দ শহরে তোমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছে। আমার পত্র পাওয়ার পর খোদা তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করো। কিন্তু তাদেরকে এমন শুষ্ক অঞ্চলে নিয়ে যেও না যেখানে হাঁটা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাদের অধিকার প্রদানে ত্রুটি করবে না পাছে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাদেরকে চোরাবালিময় অঞ্চলেও নিয়ে যাবে না কেননা, আমার নিকট এক লক্ষ দিনারের চেয়েও একজন মুসলমানের জীবন অধিক প্রিয়। ওয়াস্সালামু আলাইকা।"

এই আদেশ পালনের লক্ষ্যে হযরত নু'মান (রা.) শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট ও সাহসী মুসলমান ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ- হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান, ইবনে উমর, জারির বিন আব্দুল্লাহ্ বাজলী, মুগীরা বিন শু'বা, আমর বিন মাহদী কারেব, তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ আসদী এবং কায়েস বিন মাকশুহ্ মুরাদ-ও ছিলেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৮ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, নু'মান বিন মুকাররিন যদি শহীদ হয়ে যান তবে আমীর হবেন হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান। তার পরে হবেন জারির বিন

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

আব্দুল্লাহ বাজলী। এরপর হযরত মুগীরা বিন শু'বা এবং তঁ ার শাহাদতের ঘটনা ঘটলেআমীর হবেন, আশআস বিন কায়েস। আমর বিন মাহদী কারেব এবং তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ সম্পর্কে হযরত নু'মান (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) লিখেন, আমর বিন মাহদী কারেব এবং তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ এরা দু'জন তোমার সাথে আছে। এরা দু'জন আরবের বিখ্যাত অশ্বারোহী, তাই তাদের কাছ থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে থাকবে কিন্তু তাদেরকে কোন কাজে কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে না।

(আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

যাহোক, (এরপর) ইসলামী সৈন্যবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করে। হযরত নু'মান (রা.) গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন যে, নেহাওন্দ পর্যন্ত পথ পরিষ্কার, যেখানে শত্রু সেনাদল একত্রিত হয়েছিল।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

পূর্বেপ্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে মনে হচ্ছিল, ব্যাপক শত্রু সমাগম ঘটছে। ইতিহাসবিদেরা সৈন্যসংখ্যা কোথাও ষাট হাজার আবার কোথাও এক লক্ষ লিখেছেন

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

কিন্তু বুখারীর যে বর্ণনা রয়েছে সে অনুযায়ী এই সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিযিয়া ওয়াল মোয়াদিয়াহ, হাদীস-৩১৫৯)

অর্থাৎ পূর্বে ষাট হাজার কিংবা এক লক্ষের যে সংখ্যা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী শত্রুদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। শত্রুরা আলোচনার বাসনা ব্যক্ত করে কাউকে পাঠাতে বলে। সে অনুযায়ী হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) যান। ইরানীরা অনেক জৌলুসপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেছিল। ইরানের সেনাপতি তাজ বা মুকুট মাথায় দিয়ে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে ছিল। রাজদরবারিরা এমনসব অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে বসে ছিল যা দেখে দৃষ্টি বিস্ফারিত হতো। অনুবাদক উপস্থিত ছিল। ইরানী সেনাপতি সেই পুরনো কাহিনীই পুনরাবৃত্তি করে। আরবদের জীবনের সমস্ত ঘৃণ্য দিক সে তুলে ধরে এবং বলে, আমি আমার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট নেতাদের তোমাদেরকে মেরে ফেলার নির্দেশ এজন্য দিচ্ছি না যে, আমি চাই না তোমাদের নোংরা দেহের দ্বারা তাদের তির অপবিত্র হোক, নাউযুবিল্লাহ। তোমরা যদি এখনো ফেরত চলে যাও তবে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো অন্যথায় রণক্ষেত্রে কেবল তোমাদে র লাশ আর লাশ দেখা যাবে। শত্রুদের এমন হাস্যস্কর হুমকি-ধামকিতে কী-ইবা আসে যায়! হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যে যুগ ছিল সে যুগ এখন আর নেই। তাঁর (সা.) আবির্ভাবের ফলে সম্পূর্ণ চিত্রই বদলে গেছে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)
যাহোক, দুতিয়ালি ব্যর্থ হয় আর উভয় সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ইসলামী বাহিনীর অগ্রে নু'আয়েম বিন মুকাররিন ছিলেন। (তাঁর) ডান ও বামের নেতৃত্বে ছিলেন হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান এবং সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন। অশ্বারোহীর নেতা ছিলেন কা'কা বিন আমর। সামনের সারিতে অশ্বারোহীদের যে দল থাকে তাকে বলে মুজাররেদা। আর বাহিনীর পিছনের অংশের দায়িত্বে ছিলেন মাজাশে'।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিন্তু রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য ভীষণ কষ্টকর ছিল কেননা, শত্রুরা বিভিন্ন পরিখা, দুর্গ এবং ঘরবাড়ির কারণে সুরক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল খোলামাঠে। শত্রুরা অনুকূল পরিবেশ পেলেই আচমকা বাইরে এসে আক্রমণ করে বসতো এবং তারপর আবার নিরাপদ স্থানে ঢুকে পড়তো।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বলেন, আমি তাদেরকে এমন একটি স্থান অতিক্রম করতে দেখেছি যে, আমার মনে হতো সেটি লোহার কোন পাহাড়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

এ অবস্থা দেখে ইসলামী সেনাদলের সেনাপতি নু 'মান বিন মুকাররিন (রা.) একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন এবং এতে সেনাদের মাঝে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকদের ডাকেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, শত্রুরা কীভাবে তাদের দুর্গ, পরিখা এবং প্রাসাদগুলোর কারণে নিরাপদে বসে আছে। তাদের ইচ্ছে হলে বাইরে বের হয় আর মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে না যতক্ষণ তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের না হয়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

অপরদিকে শত্রুরা ক্রমাগতভাবে অতিরিক্ত সেনা সাহায্যও পাচ্ছে।

(আখবারুত তিওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

তিনি বলেন, আপনারা দেখছেন যে, মুসলমানরা এমন পরিস্থিতিতে কেমন এক বিপাকে জর্জরিত। বিলম্ব না করে শত্রুদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। সেনাপতির একথা শুনে উক্ত সভার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমর বিন সাবী' বলেন, শত্রুরা দুর্গে আবদ্ধ রয়েছে আর অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে। এ বিষয়টি ইসলামী সেনাবাহিনীর তুলনায় শত্রুদের জন্য বেশি কষ্টের এবং দুঃসহ। তাই, আপনি এভাবেই থাকতে দিন আর অবরোধ দীর্ঘায়িত করতে থাকুন। তবে হ্যাঁ তাদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরুবে তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখুন। কিন্তু আমর বিন সাবী'র এই পরামর্শকে সভা গ্রহণ করে নি। এরপর আমর বিন মাদী কারেব বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই সর্বশক্তি প্রয়োগে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমন করে দেয়া উচিত কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অভীজ্ঞরা যে আপত্তি করেছে তাহলো, সামনে এগিয়ে আক্রমণ করলে আমাদের মোকাবিলা মানুষের সাথে নয় বরং প্রাচিরের সাথে হবে অর্থাৎ এসব প্রাচির আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করছে। অর্থাৎ, শত্রুরা প্রকাশ্যভাবে সামনে না থেকে দুর্গের ভেতরে বসে আছে। এরপর তুলায়হা (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমার মতে এই উভয় ব্যক্তির পরামর্শই সঠিক নয়। আমার মত হলো, একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল শত্রু অভিমুখে পাঠানো হোক, যারা নিকটে গিয়ে কিছু তির বর্ষণ করে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে বা (শত্রুদের) উত্তেজিত করবে। এই দলের মোকাবিলায় শত্রুরা বাইরে বের হবে এবং আমাদের ক্ষুদ্র দলটির সাথে যুদ্ধ করবে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দলটি পিছু হটতে থাকবে এবং এমন ভাব দেখাবে যেন তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে। আশা করা যায়, শত্রুরা বিজয়ের আশায় বাইরে বেরিয়ে আসবে আর এরপর যখন তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে আসবে তখন আমরা তাদের সাথে সঠিকভাবে বোঝাপড়া করবো।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হযরত নু 'মান (রা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাকে হযরত কা'কা'র হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক। তিনি তুলায়হার প্রস্তাবানুসারে আমল করেন এবং তুলা য়হা যেভাবে বলেছিল হুবহু ঠিক তেমনই হয়েছে। কা'কা' (আপাতদৃষ্টিতে) পরাজিত হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকেন আর শত্রু সৈন্যদল বিজয়ের নেশায় সামনে এগুতে থাকে এমনকি সবাই নিজেদের দুর্গ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কেবলমাত্র দরজায় নিযুক্ত পাহারাদার সৈন্য নিজ নিজ নিরাপদ জায়গায় ভেতরে রয়ে যায়। শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী নিজেদের নিরাপদ স্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে মূল ইসলামী সৈন্যবাহিনীর এতটাই নিকটে চলে আসে যে, শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তিরে কয়েকজন মুসলমান আহতও হয়। কিন্তু তখনও হযরত নু 'মান (রা.) যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন নি। হযরত নু 'মান (রা.) রসূল প্রেমীক ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সাধারণ রীতি ছিল, সকালে যদি যুদ্ধ শুরু না হতো তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুদ্ধের ব্যবস্থা করতেন। তখন গরমের তীব্রতা থাকতো না বরং ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকতো। কতিপয় মুসলমান যুদ্ধ করার জন্যঅস্থির হয়ে গিয়েছিলেন আর শত্রুর তিরের আঘাতে কিছু মুসলমান আহত হওয়ার কারণে এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা সেনাপ্রধানের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি বলতেন, সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। অর্থাৎ কমান্ডার তাদেরকে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) অস্থির হয়ে বলেন, আমি হলে তো এতক্ষণে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিতাম। নু 'মান (রা.) উত্তরে বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। একথা ঠিক আপনি যখন আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন তখন ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতেন কিন্তু আজও আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আপনি যে জিনিষটি চটজলদি অর্জন করতে চান আমি সেটি ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জন করার আশা করি।

যখন দুপুর গড়িয়ে যেতে বসল, তখন হযরত নু 'মান (রা.) ঘোড়ায় চেপে চতুর্দিকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করলেন। প্রতিটি দলের কাছে গিয়ে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করলেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৬-৫২৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

এবং বেদনাভরা কণ্ঠে নিজের শাহাদতের জন্য দোয়া করলেন যা শুনে লোকেরা কাঁদতে শুরু করলেন। এই ঘোষণার পর তিনি (রা.) বললেন, আমি তিনবার তকবীর বলবো এবং একইসাথে পতাকা নাড়বো। প্রথমবার তকবীর বলার পর সবাই সোচ্চার হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার তকবীর বলার পর সবাই অস্ত্র তুলে নিবে অর্থাৎ অস্ত্র প্রস্তুত রাখবে এবং শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে আর তৃতীয়বার তকবীর বলা ও পতাকা নাড়ানোর সাথে সাথেই আমি শত্রুসারিতে ঝাঁপ দেবো। আর তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতিপক্ষ সারির ওপর আক্রমণ করবে। এরপর তিনি দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ধর্মকে সম্মানিত করো, তোমার বান্দাদের সাহায্য করো এবং এর প্রতিদানস্বরূপ নু 'মানকে প্রথম শহীদ হবার সৌভাগ্য দান কর"। অর্থাৎ সেনাপতি এই দোয়া করেন। হযরত নু 'মান (রা.) তৃতীয় তকবীর উচ্চারণ করার সাথে সাথে মুসলমানরা শত্রুসারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের আবেগ ও উদ্দীপনার যে অবস্থা

ছিল তাহলো, কোন একজন সম্পর্কেও এই ধারণা করা যেতে পারে না যে, তারা শহীদ হওয়া কিংবা বিজয় অর্জন করা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করতো।

নু'মান (রা.) এত তীব্রবেগে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তা দেখে প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হচ্ছিল এটি পতাকা নয় যেন কোন ঈগল ছোঁ মারছে। সর্বোপরি মুসলমানরা একজোট হয়ে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে কিন্তু এর বিপরীতে শত্রুসারিও অনঢ়-অটল ছিল। লোহার সাথে লোহার সংঘর্ষে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। মাটিতে রক্ত গড়িয়ে পড়ার কারণে মুসলমান অশ্বারোহীদের পা পিছলে যাচ্ছিল। হযরত নু'মান (রা.) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তাঁর ঘোড়াও পিছলে যায় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। সাদা রঙের পাগড়ী বা টুপি পড়ার কারণে তাকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। তাঁর ভাই নু 'আয়েম বিন মুকাররিন যখন তাঁকে পড়ে যেতে দেখেন তখন পরম বিচক্ষণতার সাথে পতাকা পড়ে যাওয়ার পূর্বে সেটিকে তুলে নেন এবং হযরত নু'মান (রা.)-কে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর পতাকা নিয়ে হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান-এর নিকট যান কেননা তিনি হযরত নু'মান (রা.)'র স্থ লাভিষিক্ত ছিলেন। হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.) নু 'আয়েম-কে নিয়ে সেস্থানে পৌঁছেন যেখানে হযরত নু'মান (রা.) ছিলেন এবং সেখানে পতাকা উড্ডীন করা হয়। হযরত মুগীরা (রা.)' র পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধের ফলাফল সামনে না আসা পর্যন্ত হযরত নু'মান (রা.)'র মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২১,৫২৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

আখবারুত্ তিওয়ালে লেখা আছে, হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রা.) যখন আহত হয়ে পড়ে যান তখন তঁ ার ভাই তঁ াকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যান এবং তিনি তার পোশাক নিজে পরিধান করেন আর তাঁর তরবারি নিয়ে তাঁরই ঘোড়ায় আরোহণ করেন। যে কারণে অধিকাংশ মানুষ ভুলবশত এটিই মনে করছিল যে, ইনিই হযরত নু'মান (রা.)।

(আখবারুত তিওয়াল, ওয়াকেয়াতু নিহাওয়ান্দ, পৃ: ১৯৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

ইতিহাসবিদ তাবারি লিখেন, চরম স্পর্শকাতর মুহূর্তে আমীরের নির্দেশ মান্য করার উন্নত দৃষ্টান্ত এটি। হযরত নু'মান (রা.) ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, যদি নু'মানও মারা যায় কেউ যেন যুদ্ধ বাদ দিয়ে তঁ ার প্রতি মনোযোগ না দেয় বরং শত্রুর মোকাবিলা অব্যাহত রাখে। মা'কেল বলেন, হযরত নু'মান (রা.) যখন মাটিতে পড়ে যান আমি তাঁর কাছে আসি। তৎক্ষণাৎ তাঁর নির্দেশ আমার মনে পড়ে এবং আমি ফেরত চলে যাই।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে দিই।

যাহোক, সারাদিন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর রাত আসতেই শত্রু পিছপা হয়। রণক্ষেত্র মুসলমানদের অনুকূলে এসে যায় এবং ইরানীদের বড় বড় নেতা মারা যায়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭-৫২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

মা'কেল বলেন, বিজয়ের পর আমি হযরত নু 'মান (রা.)'র কাছে আসি। তখনও তার প্রাণ ছিল, মৃদুশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি তঁ ার চেহারা আমার মশকের পানি দিয়ে ধৌত করি। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর মুসলমানদের কী অবস্থা তা জানতে চান? আমি বলি, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আপনাকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ জানাচ্ছি। তিনি (রা.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, হযরত উমর (রা.)-কে সংবাদ পাঠিয়ে দাও।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

হযরত উমর (রা.) যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। যে রাতে যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেই রাতটি হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে বিনিদ্র কাটিয়ে দেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

বর্ণনাকারী বলছেন, এতটা অস্থিরতার সাথে তিনি (রা.) দোয়ায় মগ্ন ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন কোন নারী প্রসব বেদনায় ক্লিষ্ট। দূত বিজয়ের সংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত উমর (রা.) আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন এবং নু'মান (রা.)'র কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। দূত তাঁর (অর্থাৎ নু'মানের) শাহাদতের সংবাদ দেন। তখন হযরত উমর (রা.) ভীষণ মর্মাহত হন। (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত) তিনি মাথায় হাত রেখে কাঁ দতে থাকেন।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

এরপর দূত অন্যান্য শহীদের নাম শোনান এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আরো অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন যাদের আপনি চিনেন না। হযরত উমর (রা.) কঁ াদতে কঁ াদতে বলেন, উমর তাদেরকে চিনে না তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ্ তো তাদেরকে চিনেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

যদিও তারা মুসলমানদের মাঝে পরিচিত নন কিন্তু আল্লাহ্ তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানীত করেছেন। আল্লাহ্ তাদের জানেন; তাই তাদেরকে উমরের চেনা না চেনায় কি যায় আসে? যুদ্ধের পর মুসলমানরা হামাদান পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। এটি দেখে ইরানী নেতা খসরু শানুম হামাদান ও রুস্তগী শহরের পক্ষ থেকে এই শর্তে সন্ধি করে নেয় যে, এই শহরগুলো থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হবে না। মুসলমান বাহিনী নিহাওয়ান্দ শহর দখল করে নেয়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

নিহাওয়ান্দের বিজয় ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরত্ববহ ছিল। এরপর ইরানীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করার সুযোগ হয়নি। আর মুসলমানরা এই বিজয়কে ফাতহুল ফুতুহ নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করে।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

ইরানে গণসামরিক অভিযানের প্রস্তাব কীভাবে সামনে এলো? লিখা আছে, যদিও নৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানের আগ্রাসী শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করার মুসলমানদের পুরো অধিকার ছিল। কেননা শত্রুরা বার বার আক্রমণ করছিল। হযরত উমর (রা.)'র কোমল হৃদয় সকল ক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটানোকে ঘৃণা করতো। হযরত উমর (রা.) এটি অপছন্দ করতেন। আর রহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, পারস্য সাম্রাজ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় পরাজিত হয়ে অতিরিক্ত সামরিক কার্যক্রম যেন বন্ধ করে দেয় এবং এই ধারাবাহিক যুদ্ধ-বিগ্রহের যেন অবসান ঘটে। হযরত উমর (রা.) এই ইচ্ছা শুধুমাত্র বার বার প্রকাশই করেন নি বরং ইরান ও ইরাকের সৈন্যদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোন সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় কঠোরভাবে বারণ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুদের আগ্রাসী সামরিক কার্যক্রম এবং বিজিত অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহের কারণে তঁ ার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত বিচক্ষণ পরামর্শদাতাদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আরও যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা ছাড়া কোনউপায় নেই। এটি ১৭ হিজরী সনের ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেননি; যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি- আর ধৈর্য ধারণের অনুমতি দিচ্ছিল না। হযরত উমর (রা.) দেখে নিয়েছিলেন, ইয়াযদাজরদ প্রতিবছর অনবরত সৈন্য প্রেরণ করে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছিল। মানুষ বার বার তঁ ার (রা.) সমীপে নিবেদন করছিলেন যে, যতদিন ইয়াযদাজরদ সিংহাসনে থাকবে, তার আচরণ পরিবর্তন হবে না। নিহাওন্দের যুদ্ধ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো দৃঢ়তা দিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে হযরত উমর (রা.) একুশ হিজরীর নিহাওন্দের যুদ্ধের পর সেনাবাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, আর সমগ্র ইরান জয়ের পরিকল্পনা করে কূফা অভিমুখে প্রেরণ করেন যা এই যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেনা ছাউনির মর্যাদা রাখত। হযরত উমর (রা.) ইরানের বিভিন্ন এলাকার জন্য পৃথক পৃথক সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর মদীনা থেকে স্বয়ং পতাকা বানিয়ে তাদের জন্য প্রেরণ করেন। খুরাসানের পতাকা আহনাফ বিন কায়েসকে, ইস্তাখলাবের পতাকা উসমান বিন আবু আসকে, আরদশির এবং সাবুরের পতাকা মুজাশে' বিন মাসউদকে, ফাসাহ্ এবং দার বাযিরদকাসের পতাকা সারিয়া বিন যুনায়েমকে, সাজিস্তানের পতাকা আসেম বিন আমরকে, মাকরানের পতাকা হাকেম বিন আমরকে প্রেরণ করেন। আর কারমানের পতাকা সুহায়েল বিন আদীকে প্রদান করেন।আযারবাইজানের বিজয়ের জন্য উতবাহ্ বিন ফারকাদ এবং বুকাইর বিন আবদুল্লাহ্কে পতাকা প্রেরণ করেন আর ডানের আক্রমন আযারবাইজানে হুলওয়ানের দিক থেকে আর অন্যজন বাম দিক থেকে, অর্থাৎ মসূ লের দিক থেকে আক্রমণ করবে। ইস্ফাহান অভিযানের পতাকা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত হয়।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৬৪-১৬৬)

ইস্ফাহান বিজয় সম্পর্কে লিখা আছে, ইস্ফাহান অভিযানের দায়িত্বভার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র ওপর অর্পিত হয়। তিনি নাহাওন্দে ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত উমর (রা.)'র ইস্ফাহানের উদ্দেশ্যে যাত্রার নির্দেশ সম্বলিত পত্র পান। (যাতে এ নির্দেশও ছিল যে) অগ্রসেনার কমান্ডার বানাবে আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা রিয়াহিকে। এছাড়া দুই পাশের দুই দলের নেতৃত্ব আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা আসদীকে এবং ইসমা বিন আব্দুল্লাহ্কে অপর্ণ করবে। আব্দুল্লাহ্ যাত্রা করেন এবং শহরতলিতে ইস্ফাহানবাসীর এক সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় আর তারা ইরানী সেনাপতি উস্তান্দারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিল। শত্রুদের অগ্রসেনার নেতা ছিল অভীজ্ঞ বৃদ্ধ শাহর বিন বারায জাযভিয়া। সে তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর তুমুল যুদ্ধ হয়। জাযভিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় আর সেনাপতি উস্তান্দার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র সাথে সন্ধি করে। ইসলামী বাহিনী ইস্ফাহানের কেন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হয়, এটি জ্যায় নামে প্রসিদ্ধ ছিল আর তারা শহর ঘিরে ফেলে। একদিন শহরের

শাসক ফাযুস্ফান বেরিয়ে এসে ইসলামী বাহিনীর আমীর আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্কে বলে, আমাদের উভয় বাহিনীর যুদ্ধ অপেক্ষা আমার এবং তোমার যুদ্ধ করাই উত্তম হবে। এরপর যে তার প্রতিপক্ষের ওপর জয়যুক্ত হবে তাকেই (ও তার বাহিনীকে) বিজয়ী আখ্যা দেওয়া হবে। আব্দুল্লাহ্ এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং বলেন, প্রথমে তুমি আক্রমণ করবে না আমি করব? ফাযুস্ফান প্রথমে আক্রমণ করে কিন্তু আব্দুল্লাহ্ অবিচল ও অটল থাকেন আর শত্রুর আঘাতে শুধু তার ঘোড়ার জিন বা গদি কেটে যায়। আব্দুল্লাহ্ ঘোড়ার খালি পিঠেই শক্ত হয়ে বসেন এবং আঘাত হানার পূর্বে তাকে সম্বোধন করে বলেন, অবিচল থেক । তখন ফাযুস্ফান বলে, আপনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সাহসী একজন মানুষ, আমি আপনার সাথে সন্ধি করে আপনার হাতে শহর তুলে দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব, সন্ধি হয়ে যায় আর মুসলমানরা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তাবারীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ বিজয় ২১ হিজরী সনে অর্জিত হয়।

(তাবারী, খণ্ড-২, পৃ: ৫৩১-৫৩২)

ঐতিহাসিক বালাযুরী এ যুদ্ধে অংশ নেয়া ইসলামী বাহিনীর আমীর হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র পরিবর্তে আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল বিন ওরকা খুযায়ীর নাম উল্লেখ করেছেন।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ১৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশকাল: ২০০০)

কিন্তু ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন, কিছু লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ওরকা আস্দী যিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এক দিকের সেনাদলের নেতৃত্বেও ছিলেন তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েলের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল হযরত উমর (রা.)' র যুগে অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধে যখন তিনি নিহত হন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৬৬-১৬৮)

হামাযানের বিদ্রোহ এবং পুনঃবিজয়। নিহাওন্দের পর মুসলমানরা হামাযানও জয় করে নিয়েছিল কিন্তু হামাযানবাসী সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আযারবাইজানের কাছ থেকে সৈন্য সহায়তা নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে। হযরত উমর (রা.) নু 'য়ায়েম বিন মুকার্রিনকে বারো হাজার সৈন্যের সাথে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তুমুল যুদ্ধের পর মুসলমানরা শহর জয় করে নেয়।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব ,প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৪৩১)

হযরত উমর (রা.) এ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এলে হযরত উমর (রা.) তার মাধ্যমেই নু 'য়ায়েম বিন মুকার্রিনকে নির্দেশ দেন, হামাযানে কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে আপনি নিজে রায় অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং সেখানে যে শত্রু-সেনাদল রয়েছে সেটিকে পরাজিত করে রায়'তেই অবস্থান করুন। কেননা, অত্র অঞ্চলে এ শহরটিই কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে।

(তারিখে ইসলাম বে আহদে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৬৯)

যাহোক, এই আলোচনা এবং অন্যান্য যুদ্ধের আলোচনা (এখনও) বাকি রয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা চলছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এ আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণও করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। তাদের মাঝে প্রথম হলেন, ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মদ দিয়ানতুনু সাহেব, যিনি গত ১৫ জুলাই ৪৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার স্ত্রী লিখেন, মরহুম একটি অ-আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু শৈশব থেকেই তার মসজিদে যাওয়ার গভীর আগ্রহ ছিল আর অন্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় তিনি ভিন্ন ধরণের ছিলেন। দীর্ঘসময় মসজিদে কাটানো, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং আল্লাহ্ তা'লার যিক্র করা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, এ সবই ছিল তার জন্য প্রকৃত নিয়ামত আর এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। গ্রামে তার একজন আহমদী বন্ধু ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় তার সেই বন্ধুর মাধ্যমে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন। মরহুম চীলীদুগ ওচীরবুন (জামা'তে) বয়আত করেন। তার বয়আত করার সংবাদ শুনতেই তার পিতা অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কেননা, তিনি মনে করতেন তার ছেলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির দরজাও তার জন্য খোলা হতো না। বাড়ির বাইরেই তাকে ঘুমাতে হতো। কিছুদিন এভাবেই চলতে থাকে। এরপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলে তিনি বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তারা তাকে জামেয়াতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা তাদের মতে তিনি মুবাল্লিগ হওয়ার যোগ্য ছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তার তবলীগ করার আগ্রহ ছিল। যাহোক, তিনি জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ২০০২ সনে জামেয়া থেকে পাশ করে বের হন। তার প্রথম নিযুক্তি হয় জেনিপু ন্তুয়া জামা'তে। তবলীগ করার প্রতি তার যেহেতু গভীর আগ্রহ ছিল, তাই তিনি দাঈআনে ইলাল্লাহ্দের সাথে বিভিন্ন গ্রামে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনিএকটি গ্রামের শত শত লোককে বয়'আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মিশন হাউজের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলে তিনি নিজেও কাজে অংশ নিতেন। সেখানে তখন জামা'তের কোন মিশন হাউজ ছিল না। তার স্ত্রী বলেন, আমার মনে আছে আমরাখুবই সাদামাটা একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম আর তা এতটাই অনাড়ম্বর ছিল যে, সেই ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্রও ছিল না। আসবাব বলতে সর্বসাকুল্যে একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং একটি চাঁটাই ছিল যার ওপর শুয়ে আমরা ঘুমাতাম। খাবাররান্নার জন্য যে হাড়িপাতিল ছিল তাতেই সব কাজ করতাম, অর্থাৎ তাতেই খাবার রান্না করতাম আর তাতেই পানি ইত্যাদি রাখতাম। তিনি বলেন, একদিন মুবাল্লিগ ইনচার্জ সুইয়ু তি আযীয সাহেব এবং প্রাদেশিক মুবাল্লিগ সাইফুল লাইয়ু ন সাহেব আমাদের বাড়ি আসেন। আমাদের ঘরের অবস্থা দেখে তারা দু 'জনই হতবাক হয়ে যান। যাহোক, এরপর জেনিপন্তুয়া কেন্দ্রের কাছে মিশন হাউজ নির্মাণের জন্য আবেদন করলে সেখানে মিশন হাউজও নির্মিত হয় আর এরপর সেখানে মসজিদও নির্মিতহয়। শুরুতে সেখানে তারা অ-আহমদী মুসলমানদের একটি যৌথ মসজিদে নামায পড়ত কিন্তু বিরোধিতার কারণে সেখানে (আহমদীদের) নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায় আর এরপর তারা একটি বাড়িতে নামায পড়ত। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। মিস্ত্রিরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় আরগ্রাম্য সর্দারও '(মসজিদ) নির্মাণ হতে দিব না' বলে হুমকী দেয়। যাহোক, এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি সাহস হারান নি এবং অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে মসজিদের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন।শ্রমিকরা না এলে খোদ্দাম ও আতফাল দিয়ে ওয়াকারে আমল করাতেন, বরং যেসব অ-আহমদী ছেলেপেলের সাথে সুসম্পর্ক ছিল তারাও (এ কাজে) অংশ নিত আর এভাবেই মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায়। তার স্ত্রী বলেন, যখন তার পদায়ন জাকার্তায় হয় তখন সেখানেও চরম বিরোধিতা ছিল। কিন্তু সেখানে বন্যা এলে সেই বিরুদ্ধবাদি অ-আহমদীরাই আশ্রয়ের জন্য আমাদের মসজিদে আসে এবং টানা দু 'বছর বন্যা হয় আর তারা আমাদের মসজিদেই আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ একদিকে তারা বিরোধিতা করে আর অপরদিকে আশ্রয়ও নিতে আসে। এর ফলে বিরোধিতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তার উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর মাঝে একটি হলো, ইন্দোনেশিয়ায় তিনি রেডিও ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জামা'তের বার্তা এবং যুগ খলীফার খুতবাগুলোর অনুবাদ সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। তখনও এখানে ইউটিউবের মাধ্যমে খুতবার সরাসরি অনুবাদ প্রচার করা আরম্ভ হয় নি। যাহোক, সারা জীবনই তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং জামা'তের একজন আদর্শ মুবাল্লিগ ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়াও পাঁচ সন্তান রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হলো, আমেরিকার শিকাগো নিবাসী সাহেবযাদা ফারহান লতিফ সাহেবের। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ সাহেবের প্রপৌত্র ছিলেন। মরহুম শিকাগো জামা'তের একজন কর্মঠ সদস্য ছিলেন। সর্বদা সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। হাস্যজ্জল মুখ এবং সবার আগে সালাম দেয়াটা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মসজিদের ছোটবড় যে কোন কাজে তাৎক্ষণিকভাবেলাব্বায়েক বলে অংশ নিতেন আর সেবার জন্য সর্বদা প্রথম সারিতে থাকতেন। শিকাগো জামা'তে অডিটরের দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করেন। মরহুম মূ সী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি ৩জন ছোট ছোট সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতামাতা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৪৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসু লভ আচরণ করুন আর (তার) সন্তানদেরকেও সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ লাহোর নিবাসী মালেক মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের, যিনি ২১ নভেম্বর (২০২০ সনে) ইন্তেকাল করেন। অনেক দিন পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তার জানাযা পড়া হয় নি। তার ছেলে তার জানাযা পড়ানোর (আবেদন জানিয়ে) লিখেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এবং প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন হযরত মওলানা গোলাম ফরীদ সাহেব (রা.)'র পুত্র ছিলেন। মিয়াঁওয়ালী জেলার দাউদ খেল জামা'তের আমীরের দায়িত্ব ছাড়াও তিনি হায়দ্রাবাদ জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে তার পিতা মালেক গোলাম ফরীদ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি তার ছোট ভাইয়ের সাথে সম্মিলিতভাবে এটি বিন্যস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।যেমনটি আমি বলেছি, জুমুআর নামাযের পর এদের সবার (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

**(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)**

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

ক্ষেত্রেও, জামাতী এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও এবং খিলাফতের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখার বিষয়ে উন্নত মান বজায় রাখতে হবে। একমাত্রই তবে ওসীয়তের কোন উপকার আছে,অন্যথায় শুধু অর্থ সংগ্র করার জন্য আমরা কাউকে ওসীয়তের অন্তর্ভুক্ত করব না।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল আমেলা সদস্যদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ন্যাশনাল আমেলা সদস্যদেরকে অন্য সকলের জন্য আদর্শ হতে হবে। আপনার জামাতের সদস্যরা ন্যাশনাল আমেলা সদস্যদেরজে যেন আদর্শ হিসেবে মনে করে। আমেলা সদস্যদের এদিকে যেন মনোযোগ থাকে যে আপনাদেরকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল-এর সঙ্গে কথা বলা সময় চাঁদাদাতাদের প্রসঙ্গে বলেন, যদি আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়, চাঁদা দিতে অসমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে চাঁদা দানের অপারগতার কথা জানিয়ে অনুমতি গ্রহণ করুন, আমাকে লিখিতভাবে জানান। কিন্তু অসত্য তথ্য দিয়ে নিজের আয়কে কম দেখাবেন না। জামাতে আহমদীয়ার মতে চাঁদা দান এক প্রকার আর্থিক ত্যাগ স্বীকার। ত্যাগস্বীকারের অর্থই হল নিজেকে কষ্টে নিপতিত করা। কিন্তু স্ত্রী সন্তানেরও অধিকার প্রদানকরতে হবে। যদি মনে করেন, এর ফলে তাদের অধিকার দিতে পারবেন, তবে এ বিষয়ে অব্যহতি চেয়ে নিন। কিন্তু অসত্য তথ্য দিবেননা। অসত্য তথ্য দিলে আল্লাহ্ তা'লা সেই টাকায় বরকত দেন না।

* এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী-এর কাছে জানতে চান যে, এবছর কতজন ওয়াকফে আরযী করেছেন? সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, চারজন ওয়াকফে আরযী করেছেন। হুযুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যস এই কয়জন! আমেলা সদস্যদের দিয়েই ওয়াকফে আরযী করিয়ে নিলে আপনাদের সংখ্যা বেড়ে যেত, অন্ততপক্ষে পনেরো জন হয়ে যেত। আপনারা বাইরের লোক খোঁজেন, নিজেদের আমেলা থেকেই নিয়ে নিন। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। আমেলা সদস্যরাই ওয়াকফে আরযী করুক না। আপনি কি নিজে ওয়াকফে আরযী করেছিলেন? ' সেক্রেটারী সাহেব বলেন, 'না, করি নি।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আপনারা নিজেরাই যখন করেন নি, তখন লোকেরা আপনাদের কি দৃষ্টান্ত দেখবে? আপনি নিজেও দুই সপ্তাহের ওয়াকফে আরযী করে কোথাও তবলীগের জন্য যান বা ছোটদেরকে কুরআন পড়ান,অথবা অন্য কোন কাজ করুন। আমেলা সদস্যরা জামাতের সদস্যদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করেন, কিন্তু নিজেরাও তো কাজ করুন। নিজেরাও ওয়াকফে আরযী করুন, দেখবেন আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখে অন্যরা এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। কুরআন করীম পড়ার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'প্রত্যেক দেশের নিজের নিজের কর্মসূচি থাকা চাই।

* হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমকে বলেন, 'ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মধ্যে কোন সেমিনার বা এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। ধর্ম এবং বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সেমিনার হোক, কাউকে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখার প্রস্তুতি নিতে বলুন যাতে শিক্ষিত যুবকদের মাঝে জামাতের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়, তারা জানতে পারে যে সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইসলাম কি বলে? বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ইসলামের মতামত কি? এই বিষয়গুলি নিয়ে কিভাবে আলোচনা করা উচিত এবং এগুলির সমাধান কি? এর ফলে তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরী হবে আর লোকেরা আপনাদের সংস্পর্শে আসবে।

* সেক্রেটারী রিশতা-নাতা (বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ক) কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আহমদী ছেলেরা জামাতের বাইরে বিয়ে করতে শুরু করে, তবে আহমদী মেয়েরা কোথায় যাবে? আহমদী মেয়েদের জন্যও চিন্তা করুন, তাদের বিয়ে-শাদির বিষয়ে ভাবুন, এদিকে মনোযোগ দিন।

* সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বলেন, এখানরা যুব-সম্প্রদায় ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদেরকে কিভাবে ধর্মের সংস্পর্শে নিয়ে আসা যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন,'তাদের জন্য আগ্রহের পরিবেশ তৈরী করুন, তাদেরকে কাছে টেনে নিন। দূরে সরে যাওয়ার কারণ, তাদের কাজকর্ম ও কথার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। তাদের তরবীয়ত করুন। এইজন্যই আমি বলি, বড়দের তরবীয়ত করুন। ন্যাশনাল আমেলার সদস্যদের তরবীয়ত করুন, স্থানীয় আমেলা সদস্যদের তরবীয়ত করুন, যাতে ছোটরা তাদের দৃষ্টান্ত দেখে নিজেদের সংশোধন করে। তাছাড়া খুদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ হল তাদেরকে একথা বোঝানো যে তারা কোন পদাধিকারীর বয়আত করে নি, আর তাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কও নেই। যদি তোমরা আহমদীয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করে থাক, বয়আত করে থাক, তবে তোমরা তাদেরকে দেখো না। তোমরা দেখ যে কোনটা সত্য শিক্ষা আর যুগ খলীফা কি বলছেন। খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে ঠিক থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-'সমসাময়িক কালের যে সব ঘটনাবলী রয়েছে, সেগুলির বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে মিটিং করুন। শুধু গতানুগতিক বৈঠক করেই বসে থাকবেন না, বরং চিন্তা করে দেখুন যে এই শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের কি কি সমস্যা রয়েছে এবং তাদেরকে কিভাবে আকৃষ্ট করে কাছে টানতে পারেন। তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করুন, তাদের আগ্রহের উপকরণ তৈরী করুন যাতে কিছুটা হলেও যেন তারা আপনাদের সাহচর্যে আসে। আপনাদের কাছাকাছি এলে তাদেরকে ধর্মের শিক্ষাও দিতে থাকুন। ধর্ম থেকে তাদের দূরত্বের কারণ হল তাদের মধ্যে জাগতিকতার প্রতি আকর্ষণ তৈরী হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জাগতিকতার প্রতি ঝোঁক লক্ষণীয়। শুধু সুইডেনের কথাই নয়, সব দেশেই এই একই প্রবণতা। তাদেরকে বল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকলে তাঁর আদেশাবলীও পালন করার চেষ্টা করা উচিত আর এই যুগে যে সব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য সেগুলি যেন তারা মেনে চলে। বড়রা যদি কোন সঠিকভাবে না করে, তবে যাতে আমাদের ভবিষ্যত যাতে প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকে, তাই সেই কাজটি সঠিকভাবে করা, তাদের উপর দায়িত্ব চাপানো এবং দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে চেতনা তৈরী করা যুবকদের কর্তব্য, তারা যেন কোনও প্রবীণের অন্যায় কাজ দেখে ধর্ম থেকে দূরে সরে না যায়। এর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন। শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করুন এরপর চিন্তাভাবনা করে একটি স্কীম তৈরী করুন যে কিভাবে তাদেরকে কাছে আনা যায়। স্কীমটি তৈরী হয়ে গেলে আমাকে জানান। মুবাল্লিগদেরও কাজ হল যুবকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, বেশি বেশি যুবকদের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। খুদ্দামুল আহমদীয়া ও মিশনারী ইনচার্যের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতায় একটি স্কীম তৈরী করা উচিত, যার মধ্যে মুবাল্লিগদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন আর জামাতের আমীরও যেন তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করেনা। তরবীয়ত বিভাগও এতে সামিল হোক আর অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুও এতে যোগ দিক- সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্ এবং সদর লাজনাও এতে দিক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এডিশিনাল তরবীয়ত সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'নওমোবাঈনদের জন্য তরবীয়তী কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যাতে তিন বছর তারা জামাতের মূলস্রোতে যোগ দিতে পারে। অ-মুসলিম পৃষ্ঠভূমি থেকে আসা যদি কোন নবাগত আহমদী থাকেন,তবে তাকে নামায, সূরা ফাতিহা, কুরআন পাঠ করার মত প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখিয়ে দিতে হবে। তাদের এমনভাবে তরবীয়ত করতে হবে যেন তারা জানতে পারে যে জামাত কি, জামাতের ব্যবস্থাপনা কি,খিলাফত কি আর খিলাফতের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রাখতে হয়? এই বিষয়গুলি তাদের ভালভাবে জানা দরকার। এরপর আসবে চাঁদার ব্যবস্থাপনা কি আর এতে কিভাবে অংশগ্রহণ করা যায়? তিন বছরের মধ্যে এই সব প্রশিক্ষণ পূর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত। তাদের ইজতেমাও করতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারীকে বলেন, 'আতফালের অফিসের দিকেও আপনি মনোযোগ দিন। খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনাদের সহযোগিতায় ছোটদেরকেও ওয়াকফে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, সাম্প্রতিককালে হোয়াটস্অ্যাপ ও সমাজমাধ্যমে অনলাইন তবলীগ ব্যপকহারে শুরু হয়েছে। এখানে লক্ষ্য রাখুন যে মানুষের মনে কোন কোন ধরণের প্রশ্ন উঠছে আর কি কি সমস্যা দেখা দিচ্ছে? বিভিন্ন সাইটে গিয়ে তাদেরকে বলুন, এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে খোদা তা'লার দিকে বেশি করে অবনত হওয়া উচিত। খোদা তা'লা দোয়া কবুল করেন না মনে করে খোদা তা'লাকে ত্যাগ করে নাস্তিক না হয়ে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আসা উচিত, নিজেদের স্রষ্টাকে চেনা উচিত। এমনটি মনে করবেন না যে খোদার অস্তিত্বই নেই, পৃথিবীই সব কিছু। যদি পৃথিবীকে রক্ষা করতে হয় তবে এই কাজগুলি কর, কেননা এরপর যে সংকট আসবে, এই মহামারির পর পৃথিবীর অর্থনীতি যেভাবে সংকুচিত হতে থাকবে, তার ফলে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হবে আর পৃথিবীর দেশসমূহ একে অপরের সম্পদ দখলের চেষ্টা করবে। অপরের সম্পদ দখলের চেষ্টা করা হলে যুদ্ধ শুরু হবে, যার জন্য বিভিন্ন জোট তৈরী হবে আর সেই জোট ইতিপূর্বেই তৈরী হতে শুরু করেছে। অতএব, এর থেকে রক্ষা পাওয়ার একটিই উপায়, খোদার দিকে এস এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝে নাও। হুযুর বলেন, এইভাবে অনলাইনের মাধ্যমে তবলীগ করুন, আর যখন এবং যেখানেই সুযোগ পান এই বার্তা পৌঁছে দিন। লকডাউনে এই পন্থা অবলম্বন করুন এবং লকডাউনে যখন কিছুটা শিথিলতা আসবে, কোন জানলা খুলবে আর আলো দেখা দিবে, তখন বাইরে বেরিয়ে তবলীগ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে কয়েকটি জরুরী কথা ছিল তা আমি বলে দিলাম। এই অনুসারে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করা উচিত, এবং তা বাস্তবায়িত করা উচিত। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মের সাক্ষী। তাই আমরা প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করব। এর জন্য নিজেদের সকল ক্ষমতা এবং উপযোগিতাকে কাজে লাগাব, যাতে আমরা জামাতের সঠিক এবং সক্রিয় কর্মী হয়ে জামাতের সঠিক অর্থে সেবাও করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের সহায় হোন, সাহায্যকারী হোন। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

(রিপোর্ট: আব্দুল মাজিদ তাহির, এডিশিনাল ওকীলুক তাবশীর, ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য)

(সৌজন্যে: আলফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ৩০ শে অক্টোবর, ২০২০)

# ২০১৩ ( সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সিঙ্গাপুর সফর

হুযুর আনোয়ারের আগমণের ফলে এতদঅঞ্চলের একাধিক দেশ থেকে জামাতের অনেক সদস্যরা সিঙ্গাপুরে আসছেন। শুধু ইন্ডোনেশিয়া থেকেই দুই হাজারেরও বেশি আহমদী সিঙ্গাপুর আসছেন। অপরদিকে মালেয়েশিয়া থেকে আগমণকারীর সংখ্যা পাঁচশর কিছু বেশি। অতিথিদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মসজিদে 'তহার আঙিনায় এবং খোলা জায়গায় মার্কি লাগিয়ে লোকদের বসার ও নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**সিঙ্গাপুরের প্রারম্ভিক আহমদী সদস্যবর্গ।**

সিঙ্গাপুরের মাটিতে বসবাসকারী মালায় জাতির মধ্য সর্বপ্রথম বয়আত করেন হাজি জাফর বিন ওয়ান্তারা সাহেব। তিনিই এদেশের প্রথম স্থানীয় আহমদী ছিলেন। তিনি হযরত মৌলানা গোলাম হোসেন সাহেব আয়ায মরহুম মুবাল্লিগের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা এদেশের মাটিতে বসবাসকারী জাতির মধ্যে যে প্রথম আহমদীয়াতের ফল দান করেছিলেন তা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, অকুতোভয় ছিল, ধৈর্য ও অবিচলতার ক্ষেত্রে পাহাড়সম ছিল। তিনি বুক চিতিয়ে বিরোধীতার তুমুল ঝঞ্ঝা বায়ুর মোকাবেলা করেছেন, বিপদে অবিচল থেকেছেন। মৌলানা মহম্মদ সিদ্দীকি সাহেব অমৃতসরী মরহুম তাঁর প্রারম্ভিক যুগের একটি ঘটনা লিখেছেন-'সিঙ্গাপুরে জামাতের প্রারম্ভিক যুগে মাননীয় হাজি জাফর ওয়ান্তারা সাহেব হযরত মৌলবী গোলাম হোসেন আয়ায সাহেবের সঙ্গে জামাতের জন্য বহু কষ্ট করেছেন। দুই তিন বার বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ভীষণভাবে প্রহৃত হন। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপায় তিনি সব সময় অবিচল থেকেছেন।

একবার কয়েকজন বিরুদ্ধবাদীর উস্কানিতে দুই আড়াই শ' অস্ত্রধারী মানুষ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে আর তারা নিজেদের একজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে হাজী সাহেব মরহুমকে তৎক্ষণাৎ আহমদীয়াত ত্যাগ করার দাবি জানায়। অন্যথায় তারা তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলার হুমকি দেয়। হাজি সাহেব মরহুম তৎক্ষণাৎ তাশাহুদ পাঠ করে ঘোষণা দেন-'আমি কি থেকে তওবা করব? খোদার কৃপায় আমি তো আগে থেকেই একজন সত্যিকার মুসলমান, আর আমাকে কোন পাপের কারণে তওবা করতেও হয় তবে তা মানুষের সামনে নয়, আল্লাহ্‌র সামনে আমার নিজের সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যখন এরপরও ভিড় শান্ত হল না, বাড়িতে ঢুকে প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকল, তখন মরহুম হাজী সাহেব মোমেন সুলভ নির্ভীকতার সাথে একটি ছুরি হাতে নিয়ে নিজ বাড়ির সীমানায় তাদের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এব তিনি গর্জে উঠে ঘোষণা দিলেন, 'সকলে একবারই মৃত্যুবরণ করে। সত্যের কারণে প্রাণের আহুতি দিলেই বা ক্ষতি কি? তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন পিতার সন্তানের আমার বাড়িতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করার সাহস থাকে, তবে সে চেষ্টা করে দেখুক তার কি পরিণতি হয়। বাড়ির অপর দিক থেকে হাজী সাহেবের সিংহী মেয়ে বের হল, হাতে তার একটি মজবুত মালাই তরবারি। সে ভয়ডরহীন হয়ে অসিচালনা করতে করতে ভিড়ের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল, 'আমার পিতা যেদিন থেকে আহমদী হয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে কোন শরিয়ত পরিপন্থী বা ইসলাম পরিপন্থী বিষয় লক্ষ্য করি নি। অধিকন্তু তিনি ঈমান ও আমলের দিক থেকে পূর্বের চেয়ে আরও খাঁটি মুসলমান এবং ইসলামের অনুরাগী হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয়। তাই আহমদীয়াত তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছে, তোমাদের এমন ধারণা অমূলক। তাই আপনাদের মধ্য থেকে যদি কেউ আমার পিতার উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায় বা অবৈধভাবে আমাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে জেনে রেখো, তার পরিণতি ভাল হবে না। আমি একজন মহিলা, তবু মনে রেখো, আক্রমণ হলে আমি তরবারি দিয়ে তিন চারজনকে মারার আগে মরছি না। এখন যার মন চায় সে নিজের ভাগ্য পরখ করে দেখে নিক।' এর ফলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সেই উত্তেজিত জনতার উপর প্রবল ভীতির সঞ্চার করল, স্থানীয় মালাই পুলিশের কয়েকজন কর্মী সেখানে দাঁড়িয়ে শান্তি রক্ষার ছুতোয় আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের সমর্থন জোগাচ্ছিল, তা সত্ত্বেও ভিড়ের মধ্য থেকে কেউই হাজী সাহেবের বাড়িতে ঢোকার বা আক্রমণ করার সাহস জোগাতে পারল না। শেষমেষ অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হাজী সাহেব মরহুম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খোদার কৃপায় আমি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বেও আহমদী ছিলাম আর আহমদীয়াত গ্রহণের পর আরও খাঁটি মুসলমান হয়েছি। কেননা আহমদীয়াত ইসলামেরই অপর নাম। একথা শুনে বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায়।"

হাজী সাহেব ১৯৬৬ সালে ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী স্থানীয় মালাই জাতিতে আহমদীয়াতের যে প্রথম বীজটি বোপিত হয়েছিল, তা আত্মোৎসর্গের উর্বর ভূমিতে বিকশিত হয়ে আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, আজ সিঙ্গাপুর জামাত সুসংগঠিত একটি জামাত। জামাতের কেন্দ্র তহা মসজিদ এবং দুইতল বিশিষ্ট সুন্দর মিশন হাউস রয়েছে যা সম্প্রতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর শুভাগমণের কারণে অতিথিতে পূর্ণ হয়ে ঈদতুল্য দৃশ্যের অবতারণা করছে।

ইন্ডোনেশিয়া,মালেয়েশিয়া, ব্রুনোই, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাপুয়া নিউ গিনি, আম্মান, দুবাই, এবং মায়ানমার থেকে জামাতের বহু সদস্য সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছে। জামাতের সদস্যদের আসা এখনও অব্যাহত আছে। পাকিস্তান ও ভারত থেকেও কিছু সদস্য এখানে এসে পৌঁছেছেন।

সিঙ্গাপুর জামাত এদের সকলের আতিথেয়তা করার সৌভাগ্য লাভ করছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের আনসার, খুদ্দাম, লাজনা ও এবং ছোটরাও দিন রাত তাঁদের সেবায় নিয়োজিত আছে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই সৌভাগ্য তাদের জন্য কল্যাণময় করুন। আমীন।

**ফিলিপাইন থেকে আসা পাঁচজন অ-আহমদী অতিথির সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত।**

সাক্ষাতকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন 'এশিয়ান এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ' এর অধ্যাপক মি. ইডি লাওজা, যিনি ওয়েস্টার্ন মিনাডানো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন।

মি. গুমালি আলিম সাহেব ফিলিপাইনে একটি বেসরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান।

মি. ইয়োল ওলায়া জাতিসঙ্ঘের অধীনস্ত শিক্ষা বিভাগে কর্মরত।

মি.কায়েসার জিমলক সাহেব চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে একজন প্রযুক্তিবিদ। পঞ্চম অতিথি হলেন মি. বারাটুকাল কাউডাঙ্গা, যিনি সাবেক শিক্ষা সচিব এবং স্টেট আটার্নী জেনারেল পদেও ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করেন, তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং কথোপকথন করেন।

* একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, খাতমে নবুয়তের বিষয়টি সাধারণ মানুষের বোধগম্যের উর্ধ্বে। মুসলমানেরা শিক্ষিত নয়, তারা এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কেন এত মাতামাতি করা হয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আমরা কবেই বা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলি। আমরা বলি না, লোকেরা যখন আলেমদের কাছে যায়,আর তারা এই প্রশ্নটি তোলে, তখন আমরা এর উত্তর দিই। যখন কেউ প্রশ্ন করে, তখন তাকে উত্তর দিয়ে বোঝাতে হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা সহজ সরল ও স্পষ্ট কথা বলি। আপনি মুসলমান, আঁ হযরত (সা.) ইমাম মাহদীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আমাদের দাবি, আঁ হযরত (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি এসে গিয়েছেন, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে যে সব নিদর্শনাবলী সম্পৃক্ত ছিল সেগুলি পূর্ণ হয়েছে। অতএব, ইমাম মাহদীকে গ্রহণ করে তাঁর বয়আত করো। ডাক্তার আলীম সাহেবকে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'এই অতিথিদেরকে 'দাওয়াতুল আমীর' বইটিও পড়তে দিন।'

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা তো একথাও বলি না যে মুসলমানেরা কনভার্ট হয়ে আহমদী হয়। এটি তো ইংরেজি ভাষার সীমাবদ্ধতা। আমরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনে। আমরা শুধু এতটুকু বলি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তথা ইমাম মাহদীর বয়আত করে তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যা এই যুগে একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থানের কাজে নিয়োজিত আর পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করছে।

এশিয়ান ইসলামিক স্টাডিজ এর প্রফেসর সাহেবকে হুযুর আনোয়ার বলেন,'এশিয়ান ইসলাম' মোটেই কোন পৃথক ইসলাম নয়। ইসলাম তো এক ও অভিন্ন, এর একজন খোদা, একজন নবী এবং একটিই কুরআন রয়েছে। লোকেরা এর পৃথক পৃথক সংগঠন এবং সংস্করণ তৈরী করে রেখেছে, যেগুলি পরবর্তীতে ফির্কায় পরিণত হয়েছে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধকে কিভাবে শান্তিতে পর্যবসিত করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর একটিই পথ- পুনরায় প্রকৃত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং প্রকৃত ধর্মতত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধ দূর করার উপায় কুরআন করীম এবং হাদীসে সন্ধান করা উচিত, সেখান থেকেই এই মতবিরোধ দূরা করার উপায় বের করতে হবে। আঁ হযরত (সা.) এই অবস্থার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমান জাতি ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তারা একে অপরের বিরোধীতা করবে, তাদের মসজিদগুলি বাহ্যত নামাযী দ্বারা পূর্ণ থাকবে, কিন্তু সেগুলি হিদায়াতশূন্য হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেতনার সৃষ্টি হবে (এবং তাদের মাঝেই ফিরে যাবে।) এছাড়া আঁ হযরত (সা.) এও বলেছিলেন যে, আগমণকারী মসীহ ও মাহদী ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন এবং তিনি এই সকল মতানৈক্যের অবসান ঘটাবেন। (ক্রমশ.....)

**বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।**

প্রশ্ন: হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

'আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশার (রা.) বিয়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স নিয়ে ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ,তফসীর এবং হাদীসের গ্রন্থসমূহে অনেক বেশি মতবিরোধ পাওয়া যায়। এই কারণে হুযুর (সা.)-এর সঙ্গে নিকাহর সময় হযরত আয়েশার (রা.) বয়স ৬ বছর থেকে ১৬ বছর এবং কন্যাবিদায়ের সয় ৯ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

যদিও হাদীসের সবচাইতে সঠিক সাতটি গ্রন্থের বর্ণনাতে, যার মধ্যে বুখারীর হাদীসও উল্লেখযোগ্য, নিকাহর সময় হযরত আয়েশার (রা.) বয়স ৬বছর এবং বিয়ের সময় নয় বছর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এগুলিকে 'দিরায়াত' ও 'রিওয়ায়েত' এর নীতি দিয়ে পরখ করা যায় তবে হযরত আয়েশার (রা.) বয়সের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বিশ্বাসযোগ্যতার মানে উত্তীর্ণ হয় না।

এ সম্পর্কে সিহাহ সিত্তা বা হাদীসের সব চাইতে সাতটি সঠিক গ্রন্থে বর্ণিত ২১টি বর্ণনার মধ্যে ১৪টি টি বর্ণনা হিশাম বিন আরওাহ-র পক্ষ থেকে এবং বাকি বর্ণনাগুলি আবু উবাইদাহ, আবু সালমাহ এবং আসওয়াদ-এর পক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইতিহাস ও জীবনীকারের এই প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী বর্ণনা করেন নি।

হযরত আয়েশার (রা.) বাল্যকালে বিবাহ নিয়ে সিংহভাগ হাদীস বর্ণনাকারী হিশাম ও আরওয়াহ-র মৃত্যর বহুকাল পেরিয়ে প্রথমবার ১৮৫ হিজরীতে হাদীসগুলি জনসমক্ষে আসে।এছাড়াও হিশাম বিন আরওয়াহ, যার জীবনের বেশির ভাগটাই মদীনায় কেটেছিল এবং তিনি মদীনার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মালিক (রহ.)-এর একজন অনুরাগী ছাত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর রচিত গ্রন্থ মোতা ইমাম মালিক=এ এই বর্ণনার উল্লেখমাত্র নেই। জীবনের উপান্তে এসে হিশাম বিন আরওয়াহ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন আর তাঁর স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি স্মৃতিভ্রংশের শিকার হন। কুফা যাওয়ার পর তিনি প্রথম হাদীস বর্ণনা করেন আর যার কাছে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনিও হিশাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় আরও চল্লিশ বছর অপেক্ষা করার পর এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, যাতে কোনও প্রকার সমর্থন বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠার সম্ভাবনাই না থাকে।

কাজেই মদীনায় থাকাকালীন হিশাম দ্বারা এই হাদীসটি বর্ণনা না করা এবং তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর রচিতগ্রন্থে তা বর্ণিত হওয়া হাদীসটি সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে। হয়তো রসুলে করীম (সা.)-এর পরিবার, বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার চরিত্রের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই এই হাদীস রচনা করা হয়েছে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। যাতে প্রমাণ করা যায়, যে পবিত্র সহধর্মিণীর বিষয়ে হুযুর (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তার কাছে ধর্শ শিখো', হুযুর (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বাল্যকালে বিবাহ হয়েছিল, যখন তিনি বাল্যসখীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতেন, আর তাঁর বাল্যাবস্থাতেই হুযুর (সা.)এর মৃত্যু হয়। তাই তার কাছে কি ধর্ম শেখা যায়?

অতঃপর সহী বুখারীতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও হযরত আয়েশার নিকাহ সংক্রান্ত হাদীসে বৈপরীত্য পাওয়া যায়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, 'হযরত খাদীজা (রা.)এর মৃত্যুর তিন বছর পর হুযুর (সা.) আমাকে বিয়ে করেন।' অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত খাদীজা (রা.) হুযুর (সা.)এর মদিনা আগমণের তিন বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। এরপর হুযুর (সা.) প্রায় দুই বছর পর হযরত আয়েশা (রা.)কে নিকাহ করেন।

কাজেও, হাদীস সংগ্রহকারীরা যদিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই কাজ সমাধা করেছেন, তবু এর মধ্যে ভ্রান্তি ও সন্দেহের রেশ থেকেই যায়। কেননা, হুযুর (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় দেড়-দুশ' বছর পর এই কাজ শুরু হয়, যখন কিনা মুসলমানেরা একাধিক ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে নানান প্রকারের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই যুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অন্যান্য বিষয়গুলির সংশোধনের ন্যায় এই বিষয়টিরও সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। তিনি বলেন, 'যদিও আমরা হাদীসকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে হাদীস কুরআন করীমের পরিপন্থী, আঁ হযরত (সা.)এর সম্মানের পরিপন্থী, আমরা সেগুলিকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? সেটি হাদীস একত্রিত করার সময় ছিল, যদিও তারা ভেবেচিন্তে হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হন নি। সেটি ছিল হাদীস সংগ্রহ করার সময় আর এখন গভীর অভিনিবেশ করার সময়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৭২)

হযরত আয়েশার (রা.) বয়স সংক্রান্ত বিষয়টিকে যখন আমরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই করি, তখন ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থের আমরা জানতে পারি যে হুযুর (সা.)-এর নবুয়্যতের পূর্বেই হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) চার সন্তান (হযরত আব্দুল্লাহ্, হযরত আসমা, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত আয়েশা) -এর জন্ম হয়েছিল। আর জীবনীকারদের সংকলিত প্রারম্ভিক মুসলমানদের তালিকায় হযরত আয়েশার (রা.) নামও রয়েছে। হযরত আয়েশার জন্ম যদি নবুয়তের ৫ম বছরে হয়ে থাকে, তবে প্রারম্ভিক মুসলমানদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত কিভাবে হল?

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, হযরত আসমা হযরত আয়েশার থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন আর হিজরতের সময় হযরত আসমার বয়স ২৭ বছর ছিল। এই হিসেবেও হযরত আয়েশার জন্ম সাল নবুয়্যতের ৪ বছর পূর্বে দাঁড়ায়। আর তাঁর নিকাহ যদি হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর বয়স দাঁড়ায় ১৪ বছর।

২য় হিজরী সনে সংঘটিত উহদের যুদ্ধের বিষয়ে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে হযরত আবু বাকার কন্যা হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সেলিম পিঠে করে পানির মশক বয়ে এনে লোকদের পানি পান করাতেন। যদি হযরত আয়েশার বয়স এতই কম হত, তবে পিঠে করে পানি বয়ে এনে কিভাবে ছোটাছুটি করে যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈন্যদেরকে পানি খাওয়াতে পারতেন? এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে ২য় হিজরী সনে তিনি অবশ্যই এতটা পরিণত বয়সের হয়েছিলেন যে যুদ্ধের ময়দানে এই ধরণের ভারি কাজ করতে পারতেন।

ইতিহাসের পুস্তকে এই সত্যও রয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে হযরত আয়েশার (রা.) জুবায়ের বিন মুতইম সঙ্গে বাগদান হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বাগদান হওয়াই বলে দিচ্ছে তাঁর বয়স ছয় বছর ছিল না। বিশেষ করে এই কারণেও যে, যখন রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু বাকার হযরত আয়েশার জন্য বিবাহ প্রস্তাব পান, তখন হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) জুবায়ের বিন মুতইম কে হযরত আয়েশার কন্যাদানের বিষয়ে জানতে চান। তার পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান হলে সম্পর্কটি ভেঙে যায়, অতঃপর হুযুর (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশার নিকাহ সম্পন্ন হয়। হযরত আবুবাকার সিদ্দীকের জুবায়ের বিন মুতইমকে কন্যাদানের বিষয়ে জানতে চাওয়াই প্রমাণ করছে যে সেই সময় হযরত আয়েশার বয়স ছয় বছর মোটেই ছিল না,বরং তিনি তখন বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর গবেষণাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হযরত আয়েশার (রা.) বয়সের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির প্রতি অভিনিবেশ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিয়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স তেরো থেকে চৌদ্দ বছর ছিল আর এটিই সঠিক বয়স। এই হিসেবে আঁ হুযুর (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশার (রা.) বয়স একুশ বছর হয় যা ধর্মীয় শিক্ষার্জনের পূর্ণতা এবং সেই শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম বয়স।

এই যুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.) এ সঙ্গে হযরত আয়েশার বিয়ের সময় ৯ বছর বয়স হওয়ার বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ইসলামের এক বিরুদ্ধবাদী পাদ্রী ফতেহ মসীহর আপত্তির উত্তরে বলেন-" "

(নুরুল কুরআন, নং ২ রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

অনুরূপভাবে অন্যত্র হুযুর (আ.) বলেন- 'হযরত আয়েশার (রা.) বয়স নয় বছর হওয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কোন হাদীস বা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়।"

(আরইয়া ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

কাজেই সারাংশ এই যে, হযরত আয়েশার (রা.) বিবাহ প্রসঙ্গে যে সমস্ত হাদীসে তাঁর বয়স ৯ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা উপেক্ষনীয়। এই হাদীসগুলিতে হয় বর্ণনাকারীরা ভুল করেছেন, অথবা পরবর্তীকালের বর্ণনাকারীরা নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে পড়লে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হবে যে হযরত আয়েশার (রা.) বয়স যথাযথ ছিল, কুরায়েশরা সাধারণত যে বয়সে বিয়ে দিত। এই বিবাহটি তৎকালীন আরবের পরিবেশ অনুসারে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ছিল না আর এর মধ্যে আপত্তিযোগ্য এমন কোনও বিষয়ও ছিল না যে মুনাফেক ও কুফফাররা এনিয়ে কোন আপত্তি বা কটাক্ষ করত বা বিস্ময় প্রকাশ করত।

## যুগ খলীফার বাণী

**পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।**

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 23 Sep, 2021 Issue No.38

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

## কুরআন করীমকে অবশ্যই অর্থসহকারে পাঠ করা একজন মুসলমানের কর্তব্য, এর প্রতি উদাসীনতা বড়ই দুর্ভোগের কারণ হয়েছে।

## মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে কুরআন করীমের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার করেছেন যে অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক, তারা এটিকে পাঠ করতে থাকে। যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায়, এটিও এই আয়াতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতির সত্যায়ন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর- এর ১০ আয়াত اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

'কুরআনের একজন ইংরেজ অনুবাদক লেখেন,'কুরআন করীম এমন ভাষায় লেখা আছে যে সেটিকে সুর করে পড়া ছাড়া উপায় নেই। অতএব, কুরআন করীমের ভাষা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি করা সেইসব উপকরণের মধ্য থেকে একটি যার মাধ্যমে কুরআন মজীদকে রক্ষা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষদের সৃষ্টি করছেন যারা এটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত করত। দ্বিতীয়ত, এর ভাষাকে এমন সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করেছেন যাতে সহজে মুখস্ত হয়। তৃতীয়ত নামাযে এর তিলাওয়াত আবশ্যক করেছেন। চতুর্থত, এটি পাঠ করার প্রতি মানুষের মনে অসাধারণ এক অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন।

খৃষ্টানগণ সব সময় এই আপত্তি করে থাকেন যে, মুসলমানেরা কুরআন করীমকে বৃথায় পড়তে থাকে, এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না। কিন্তু যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায়, এটিও এই আয়াতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতির সত্যায়ন। মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে কুরআন করীমের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার করেছেন যে অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক, তারা এটিকে পাঠ করতে থাকে। কুরআন করীমকে অর্থসহকারে পাঠ করা অবশ্যই একজন মুসলমানের কর্তব্য, এর প্রতি উদাসীনতা বড়ই দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। কিন্তু এই যে অর্থ না জেনেও মুসলমানেরা কুরআন করীম মুখস্ত করে চলে, নিঃসন্দেহে, এই আয়াতে উল্লেখিত সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ।

আজ যদি বাইবেলের সমস্ত সংস্করণ পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে এর অনুসারীরা ৫ শতাংশও পুনরায় একত্রিত করতে পারবে না। কিন্তু কুরআন মজীদের এমন বিশেষত্ব রয়েছে, যদি (তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে) কুরআন মজীদের সমস্ত অনুলিপিগুলি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল, তবু দুই-তিন দিনের মধ্যে পরিপূর্ণ কুরআন মজীদ পুনরায় অস্তিত্ব ফিরে পেতে পারে। বড় বড় শহরের কথা বাদই দিলাম, আমরা কাদিয়ানের মত ছোট্ট জনপদেও তা তৎক্ষণাৎভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিয়ে নিতে পারি।

পবিত্র কুরআন করীম ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যা বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরও সংরক্ষিত থাকতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের সংরক্ষণের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা করেছেন, এমন উপকরণ তৈরী করেছেন, যার কারণে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর এর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কথিত আছে, একবার রাশিয়া সরকার জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলি বাদ দিয়ে কুরআন করীম ছাপাতে মনস্থির করে। কিন্তু তাদেরকে জানানো হয় যে কুরআন করীম তো সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, এই আয়াতগুলি সর্বত্র পাওয়া যাবে, তাই তোমরা কিভাবে এগুলিকে বের করে দিতে পারবে? এই কথা শুনে তারা নিজেদের পরিকল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়।

কুরআন করীম সংরক্ষণের আরও একটি পদ্ধতি ছিল ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি কুরআন করীমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এর মাধ্যমে কুরআন করীমের প্রতিটি হরফ সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে। যেমন, কুরআন করীমের সেবার উদ্দেশ্যে আরবী ব্যকরণ তৈরী হল। কথিত আছে যে, আরবী ব্যকরণ তৈরী হওয়ার পর আবুল আসওয়াদ দাউলি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এসে বলেন,' একজন মুসলমান "اَنَّ اللّٰہَ بَرِیۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۬ۙ وَرَسُوۡلُہٗ" এর পরিবতে 'রাসুলিহি' পাঠ করছিল। আমার আশঙ্কা হয়, নবাগত মুসলিমরা কুরআন করীমের অর্থ বুঝতে সমস্যায় পড়বে।' হযরত আলী (রা.) সেই সময় ঘোড়ায় চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই তাকে ব্যকরণের কিছু নিয়ম বলে দিয়ে গেলেন, সেই সঙ্গে এও নির্দেশ দিলেন এই ধরণের নিয়মকে বিধিবদ্ধ করতে। এতে করে সেই সব নবাগত মুসলমানরা সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে পারত। তিনি কয়েকটি নিয়ম বলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন-'উনহু নাহওয়াহু' অর্থাৎ এইভাবেই আরও নিয়ম তৈরী কর। এই বাক্যের কারণে আরবী ব্যকরণের নাম 'নাহওয়া' প্রচলন পেয়েছে। অতঃপর মুসলমানেরা ইতিহাস লেখার ধারা প্রবর্তন করেছে, সেটিও কুরআন করীমের সেবার জন্য। কেননা, কুরআন করীমে বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল, সেগুলিকে তারা যখন একত্রিত করতে শুরু করল, তখন সেগুলির পাশপাশি বাকি দুনিয়ার কথাও একত্রিত করে দেওয়া হল। এরপর হাদীসের জ্ঞানও কুরআন করীমের সেবার জন্য আরম্ভ হয়েছিল, যাতে জানা যায় যে আঁ হযরত (সা.) কুরআন করীমের কি অর্থ করেছেন।

অতঃপর কুরআন মজীদের উপর দার্শনিকদের আপত্তিকে প্রতিহত করার করার জন্য মুসলমানেরা দর্শনশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তন করে এবং যুক্তিশাস্ত্রেরর জন্য নতুন অথচ অধিক গবেষণাধর্মী পথ উদ্ভাবন করে। এছাড়াও কুরআন মজীদের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। আরবী ব্যকরণে উদাহরণ দিতে গেলে কুরআন মজীদের আয়াত উপস্থাপন করা হত। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহকে সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বস্তুত, সমস্ত প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতকে ধ্রুবক হিসেবে উদ্ধৃত করা হত। আমি মনে করি, এই বই=পুস্তকগুলি থেকে যদি কুরআনের আয়াতগুলিকে একত্রিত করা যায়, তবে সেগুলি দিয়েও সমগ্র কুরআন সংকলন করা সম্ভব হবে। কুরআন করীমের সেবার জন্য মুসলমানদের অন্যান্য জ্ঞানের জগতে প্রত্যাবর্তন করার আরও একটি আনুষঙ্গিক উপকারও হয়েছে। ধমীয় পণ্ডিতরা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে ভীষণ রকমের উদাসীন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্য এই জ্ঞানের বিদ্বানেরা সবসময় কুরআন মজীদের সেবা করেছে। কেননা, তারা মনে করে, কুরআন করীম প্রকৃত জ্ঞানের পরিপন্থী নয়, বরং সমর্থক।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮)

## নিকাহ-র ঘোষণা

গত ১৮ই জুলাই, ২০২১ তারিখে কাযিওয়ালী চক নিবাসী তথা বিহারের ভাগলপুর জামাতের সদস্য মাননীয় ডক্টর মনসুর আহমদ সাহেবের পুত্র মাননীয় আরিফ আহমদ সাহেবের সঙ্গে রতনপুর নিবাসী মাননীয় আযিযুর রহমান সাহেবের কন্যা তথা মরহুম রওশন আলি সেখ সাহেবের দৌহিত্রী মাননীয়া আমাতুল বুশরা সাহেবার নিকাহ পাঠ করেন মাননীয় আবু তাহের মণ্ডল সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা। আল্লাহ্ করুন এই বিবাহ বন্ধন উভয় পরিবারের জন্য কল্যাণময় হোক। আমীন।

### যুগ খলীফার বাণী

**সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।**

**(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

### মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।**

**(সুনান সঈদ বিন মনসুর)**

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir